শ্রীঅরবিন্দ

গীতার ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী
'৬১

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

১৩১৬ সালের সাপ্তাহিক "ধর্ম্ম" পত্রে প্রথম প্রকাশিত
(১৮ই আশ্বিন হইতে ২রা ফাল্গুন পর্য্যন্ত)

প্রথম সংস্করণ		...	আশ্বিন,	১৩২০
দ্বিতীয়	„	...	...	১৩২৭
তৃতীয়	„	...	...	১৩৩৪
চতুর্থ	„	...	আষাঢ়,	১৩৫৮
পঞ্চম	„	...	„	১৩৫৮

মূল্য দুই টাকা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

বিষয়-সূচী

প্রস্তাবনা ১

বক্তা ... ৩

পাত্র ৬

অবস্থা ... ১২

প্রথম অধ্যায় ... ১৯

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি ... ০

দুর্য্যোধনের বাক্‌কৌশল ... ৩৪

পূর্ব্ব সূচনা ৩৬

বিষাদের মূল কারণ ... ৩৮

বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ ৪০

বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ ... ৪২

বৈষ্ণবী মায়ার ক্ষুদ্রতা ... ৪৪

কুলনাশের কথা ... ৪৬

বিদ্যা ও অবিদ্যা ৪৮

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য ... ৫৪

ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ ...

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল ... ৬১

দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৯

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর ৭০

কৃপা ও দয়া ৭০

অর্জ্জুনের শিক্ষাপ্রার্থনা ৭৪

মৃত্যুর অসত্যতা ৮১

মাত্রা ৮৪

সমভাব ৮৫

সমতার গুণ ৮৬

দুঃখজয় .. ৮৭

পরিশিষ্ট

বিশ্বরূপ দর্শন ৮৯

গীতার ভূমিকা

প্রস্তাবনা

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্ম্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্ম্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্ম্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্ম্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ।

গীতা অযুতরত্নপ্রসূ অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই সমুদ্রের নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে করিতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না, তল পাওয়া যায় না। শত বৎসর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই অনন্ত রত্নভাণ্ডারের সহস্রাংশ ধনও আহরণ করা দুষ্কর। অথচ দু-একটি রত্ন উদ্ধার করিতে পারিলে দরিদ্র ধনী হন, গভীর চিন্তাশীল জ্ঞানী, ভগবদ্বিদ্বেষী প্রেমিক, মহাপরাক্রমী শক্তিমান কর্ম্মবীর তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ও সন্নদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সর্ব্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।

এইরূপ গভীর ও গুপ্তজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক অথচ ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, রচনা সরল, বাহ্যিক অর্থ সহজবোধগম্য। গীতাসমুদ্রের অনুচ্চ তরঙ্গের উপরে উপরে বেড়াইলেও, ডুব না দিলেও, কতক শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। গীতারূপ আকরের রত্নোদ্দীপিত অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ না করিয়া চারিপার্শ্বে বেড়াইলেও তৃণের মধ্যে পতিত উজ্জ্বল মণি পাওয়া যায়, ইহজীবনের তরে তাহাই লইয়া ধনী সাজিতে পারিব।

গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আসিবে না যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগৎশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত বা গভীর জ্ঞানী গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যে তাঁহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইলে বলিতে পারি, হইয়াছে, ইহার পরে আর গীতার ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত অর্থ বোঝা গেল। সমস্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া এই জ্ঞানের কয়েকদিক মাত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব, বহুকাল যোগমগ্ন হইয়া বা নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরূঢ় হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিব যে গীতোক্ত কয়েকটি গভীর সত্য উপলব্ধি করিলাম বা গীতার দু-একটি শিক্ষা ইহজীবনে কার্য্যে পরিণত করিলাম। লেখক যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, যেটুকু কর্ম্মপথে

অভ্যাস করিয়াছেন, বিচার ও বিতর্ক দ্বারা তদনুযায়ী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অপরের সাহায্যার্থ বিবৃত করা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

বক্তা

গীতার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে বক্তা, পাত্র ও তখনকার অবস্থার কথা বিচার করা প্রয়োজন। বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র তাঁহার সখা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, অবস্থা কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

অনেকে বলেন, মহাভারত রূপকমাত্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অর্জুন জীব, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রিপু সকল, পাণ্ডবসেনা মুক্তির অনুকূল বৃত্তি। ইহাতে যেমন মহাভারতকে কাব্যজগতে হীন স্থান দেওয়া হয়, তেমনই গীতার গভীরতা, কর্ম্মীর জীবনে উপযোগিতা ও উচ্চ মানবজাতির উন্নতিকারক শিক্ষা খর্ব্ব ও নষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রের ফ্রেম নয়, গীতোক্ত শিক্ষার মূল কারণ এবং গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কাল্পনিক অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, গীতার ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম, সংসারে আচরণীয় ধর্ম্ম না হইয়া সংসারে অনুপযোগী শান্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মে পরিণত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। শাস্ত্রে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারবাদ এবং দশম অধ্যায়ে বিভূতিবাদ

অবলম্বন করিয়া ভগবান সর্ব্বভূতের দেহে প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত বিশেষ বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতক পবিমাণে ব্যক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-দেহে পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কুরুক্ষেত্র রূপকমাত্র, সেই রূপক বর্জন কবিয়া গীতার আসল শিক্ষা উদ্ধাব কবিতে হয, কিন্তু সেই শিক্ষাব এই অংশ বাদ দিতে পাবি না। অবতাববাদ যদি থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিব কেন? অতএব স্বয়ং ভগবান এই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচাবক।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে মনুষ্যেব শাবীবিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসাবে লীলা কবিযা গিযাছেন। সেই লীলার প্রকাশ্য ও গূঢ় শিক্ষা যদি আযত্ত কবিতে পাবি, এই জগদ্ব্যাপী লীলাব অর্থ উদ্দেশ্য ও প্রণালী আয়ত্ত কবিতে পাবিব। এই মহতী লীলাব প্রধান অঙ্গ পূর্ণজ্ঞানপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের মধ্যে ও সেই লীলাব মূলে কি জ্ঞান নিহিত ছিল, গীতায় তাহা প্রকাশিত হইল।

মহাভাবতেব শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মবীব, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, বাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার জীবনে মহাশক্তিব অতুলনীয় বিকাশ ও বহস্যময ক্রীড়া দেখি। সেই বহস্যের ব্যাখ্যা গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপ্রভু, বিশ্বব্যাপী বাসুদেব, অথচ স্বীয় মহিমা প্রচ্ছন্ন কবিয়া পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি, সখা, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি সম্বন্ধ মানবদিগের সহিত স্থাপন কবিয়া লীলা করিয়াছেন। তাঁহার

জীবনে আর্য্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বহস্য এবং ভক্তিমার্গেব উত্তম শিক্ষা নিহিত আছে। ইহাব তত্ত্বগুলিও গীতোক্ত শিক্ষার অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপব ও কলিযুগেব সন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইযাছেন। কল্পে কল্পে সেই সন্ধিস্থলে ভগবান পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ হন। কলিযুগ চতুর্যুগেব মধ্যে যেমন নিকৃষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগ মানবোন্নতিব প্রধান শত্রু পাপপ্রবর্ত্তক কলিব রাজ্যকাল. মানবেব অত্যন্ত অবনতি ও অধোগতি কলিব বাজ্যকালে হয়। কিন্তু বাধাব সহিত যুদ্ধ কবিতে কবিতে শক্তিবৃদ্ধি হয়, পুবাতনেব ধ্বংসে নূতনের সৃষ্টি হয়, কলিযুগেও সেই নিয়ম দেখা যায়। জগতের ক্রমবিকাশে অশুভেব যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, তাহাই কলিযুগে অতিবিকাশে নষ্ট হয, এই দিকে নূতনেব বীজ বপিত ও অঙ্কুবিত হয়, সেই বীজই সত্যযুগে বৃক্ষে পবিণত হয়। উপবন্তু যেমন জ্যোতিষ বিদ্যায একটি গ্রহেব দশায সকল গ্রহের অন্তর্দ্দশা ভোগ হয, তেমনই কলিব দশায সত্য, ত্রেতা, দ্বাপব, কলি নিজ নিজ অন্তর্দ্দশা বাববার ভোগ কবে। এইরূপ চক্রগতিতে কলিযুগে ঘোব অবনতি, আবাব উন্নতি, আবার ঘোবতব অবনতি, আবাব উন্নতি হইযা ভগবানেব অভিসন্ধি সাধিত হয। দ্বাপব কলিব সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অশুভের অতিবিকাশ, অশুভের নাশ, শুভেব বীজবপন ও অঙ্কুবপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা করিযা যান, তাহার পবে কলিব আরম্ভ হয। শ্রীকৃষ্ণ এই গীতার মধ্যে সত্যযুগানয়নের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রণালী রাখিয়া গিযাছেন। কলিব সত্য অন্তর্দ্দশার

আগমনকালে গীতাধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী। সেই সময় উপস্থিত বলিয়া গীতার আদর কয়েকজন জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণে এবং ম্লেচ্ছ-দেশে প্রসারিত হইতেছে।

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার গীতারূপ বাক্য স্বতন্ত্র করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

পাত্র

গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাবীর ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন। যেমন বক্তাকে বাদ দিলে গীতার উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় অর্থ উদ্ধার করা কঠিন, তেমনই পাত্রকে বাদ দিলে সেই অর্থের হানি হয়।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, এক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা মানবদেহধারী পুরুষোত্তমের সহিত স্ব স্ব অধিকার ও পূর্ব্বকর্ম্মভেদানুসারে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সাত্যকি তাঁহার অনুগত সহচর ও অনুচর, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মন্ত্রণাচালিত আত্মীয় ও বন্ধু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের ন্যায় কেহই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সমবয়স্ক পুরুষে পুরুষে যত মধুর ও নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে সেই সকল মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাঁহার প্রিয়-তম সখা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম ভগিনী সুভদ্রার স্বামী। চতুর্দ্দ

অধ্যাযে ভগবান এই ঘনিষ্ঠতা অর্জ্জুনকে গীতার পরম রহস্য শ্রবণেব পাত্ররূপে ববণ কবিবার কাবণ বলিযা নির্দ্দেশ করিযাছেন।

স এবাযং মযা তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

"এই পুবাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমাব ভক্ত সখা বলিয়া তোমাব নিকট প্রকাশ কবিলাম। কাবণ, এই যোগ জগতের শ্রেষ্ঠ ও পবম রহস্য।" অষ্টাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্দ্রস্বরূপ কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র ব্যক্ত কবিবার সময এই কথাব পুনরুক্তি হইযাছে।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

"আবাব আমার পবম ও সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমাব অতীব প্রিয়, সেই হেতু তোমার নিকট এই শ্রেযঃ পথেব কথা প্রকাশ করিব।" এই শ্লোকদ্বয়েব তাৎপর্য্য শ্রুতিব অনুকূল, যেমন কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধযা ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

"এই পবমাত্মা দার্শনিকের ব্যাখ্যা দ্বারাও লভ্য নহে, মেধাশক্তিদ্বাবাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে।

ভগবান যাঁহাকে ববণ করেন, তাঁহাবই লভ্য ; তাঁহাবই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় শবীর প্রকাশ কবেন।" অতএব যিনি ভগবানেব সহিত সখ্য ইত্যাদি মধুব সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানেব পাত্র।

ইহার মধ্যে আর এক অতি প্রযোজনীয কথা নিহিত। ভগবান অর্জুনকে এক শবীরে ভক্ত ও সখা বলিযা ববণ করিলেন। ভক্ত নানবিধ ; সাধাবণতঃ কাহাকেও ভক্ত বলিলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। সেই ভক্তির মূলে প্রেম আছে বটে, কিন্তু সাধাবণতঃ বাধ্যতা সম্মান ও অন্ধভক্তি তাহাব বিশেষ লক্ষণ। সখা কিন্তু সখাকে সম্মান করেন না ; তাঁহাব সহিত ক্রীড়াকৌতুক আমোদ ও স্নেহ-সম্ভাষণ কবেন ; ক্রীড়ার্থ তাঁহাকে উপহাস ও তাচ্ছিল্যও করেন, গালি দেন, তাঁহার উপব দৌরাত্ম্য কবেন। (সখা সর্ব্বকালে সখাব বাধ্য হয়েন না, তাঁহার জ্ঞানগবিমা ও অকপট হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইয়া যদিও তাঁহাব উপদেশানুসারে চলেন, সে অন্ধভাবে নহে ; তাঁহার সহিত তর্ক কবেন, সন্দেহ সকল জ্ঞাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মতেব প্রতিবাদও করেন। ভযবিসর্জন সখ্য সম্বন্ধের প্রথম শিক্ষা ; সম্মানের বাহ্য আড়ম্বব বিসর্জন তাহাব দ্বিতীয় শিক্ষা ; প্রেম তাহার প্রথম ও শেষ কথা। যিনি এই জগৎসংসারকে মাধুর্য্যময়, বহস্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় ক্রীড়া বুঝিয়া ভগবানকে ক্রীড়াব সহচররূপে বরণ করিয়া সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র।) যিনি ভগবানের মহিমা, প্রভুত্ব, জ্ঞানগরিমা, ভীষণত্বও

হৃদয়ঙ্গম করেন, অথচ অভিভূত না হইয়া তাঁহাব সহিত নির্ভযে ও হাসিমুখে খেলা কবিযা থাকেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানেব পাত্র।

সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে ক্রীডাচ্ছলে আব সকল সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সখ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অতি মধুব হয, এইরূপ সম্বন্ধই অর্জুন গীতাব প্রাবম্ভে শ্রীকৃষ্ণেব সহিত স্থাপন কবিলেন। "তুমি আমাব পবম হিতৈষী বন্ধু. তোমা ভিন্ন কাহাব শবণাপন্ন হইব? আমি হতবুদ্ধি, কর্ত্তব্য-ভাবে ভীত, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তীব্রশোকে অভিভূত। তুমি আমাকে বক্ষা কব, উপদেশ দান কব, আমাব ঐহিক পাবত্রিক মঙ্গলেব সমস্ত ভাব তোমাব উপব ন্যস্ত কবিলাম।" এই ভাবে অর্জুন মানবজাতিব সখা ও সহানেব নিকট জ্ঞানলাভার্থ আসিয়াছিলেন। আবাব মাতৃসম্বন্ধ এবং বাৎসল্যভাবও সখ্যে সন্নিবিষ্ট হয। বযোজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, কনীযান ও অল্পবিদ্য সখাকে মাতৃবৎ ভালবাসেন, বক্ষা কবেন, যত্ন কবেন, সর্ব্বদা কোলে বাখিযা বিপদ ও অশুভ হইতে পবিত্রাণ কবেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণেব সহিত সখ্য স্থাপন কবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব নিকট স্বীয মাতৃরূপও প্রকাশ কবেন। সখ্যেব মধ্যে যেমন মাতৃপ্রেমেব গভীবতা, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমেব তীব্রতা ও উৎকট আনন্দও আসিতে পাবে। সখা সখাব সান্নিধ্য সর্ব্বদা প্রার্থনা কবেন, তাঁহাব বিবহে কাতব হযেন, তাঁহাব দেহস্পর্শে পুলকিত হয়েন তাঁহাব জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে আনন্দভোগ করেন। দাস্য সম্বন্ধও সখ্যেব ক্রীডাব অন্তর্ভূক্ত হইলে অতি মধুব হয়।

বলা হইযাছে, যিনি যত মধুর সম্বন্ধ পুরুষোত্তমের সহিত স্থাপন করিতে পাবেন, তাঁহাব সখ্যভাব তত প্রস্ফুটিত হয় এবং তত গীতোক্ত জ্ঞানেব পাত্রত্ব লাভ হয।

কৃষ্ণ-সখা অর্জুন মহাভাবতেব প্রধান কর্ম্মী, গীতায় কর্ম্ম-যোগশিক্ষা প্রধান শিক্ষা। (জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিন মার্গ পবস্পর বিবোধী নহে, কর্ম্মমার্গে জ্ঞান-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে ভক্তিলব্ধ শক্তি প্রযোগ কবিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে তাঁহাবই সহিত যুক্ত হইযা তাঁহাবই আদিষ্ট কর্ম্ম কবা গীতোক্ত শিক্ষা)। যাঁহাবা সংসাবেব দুঃখে ভীত, বৈবাগ্য-পীড়িত, ভগবানেব লীলায জাতবিতৃষ্ণ, লীলা পবিত্যাগ কবিযা অনন্তেব ক্রোড়ে লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেব মার্গ স্বতন্ত্র। বীবশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধব অর্জুনেব সেইরূপ কোনও ইচ্ছা বা ভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কোন শান্ত সন্ন্যাসী বা দার্শনিক জ্ঞানীব নিকট এই উত্তম বহস্য প্রকাশ কবেন নাই, কোন অহিংসাপরাযণ ব্রাহ্মণকে এই শিক্ষাব পাত্র বলিযা ববণ কবেন নাই, মহাপবাক্রমী তেজস্বী ক্ষত্রিয যোদ্ধা এই অতুলনীয় জ্ঞানলাভেব উপযুক্ত আধাব বলিয়া নির্ণীত হইযাছিলেন। যিনি সংসাব-যুদ্ধে জয বা পবাজযে অবিচলিত, তিনিই এই শিক্ষাব গূঢ়তম স্তবে প্রবেশ কবিতে সমর্থ। (নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ) যিনি মুমুক্ষুত্ব অপেক্ষা ভগবান-লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তিনিই ভগবৎ-সান্নিধ্যেব আস্বাদ পাইযা আপনাকে নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান বলিযা উপলব্ধি কবিতে এবং মুমুক্ষুত্ব অজ্ঞানের শেষ আশ্রয় বুঝিয়া বর্জন কবিতে সক্ষম। যিনি তামসিক ও রাজসিক

অহঙ্কার বর্জন করিয়া সাত্ত্বিক অহঙ্কারে বদ্ধ থাকিতে চাহেন না তিনিই গুণাতীত হইতে সক্ষম। অর্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে রাজসিক বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, অথচ সাত্ত্বিক আদর্শ গ্রহণে রজঃশক্তিকে সত্ত্বমুখী করিয়াছেন। সেইরূপ পাত্র গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম আধার।

অর্জুন সমসাময়িক মহাপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, সেই যুগের সর্ববিধ সাংসারিক জ্ঞানে পিতামহ ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানতৃষ্ণায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর শ্রেষ্ঠ, সাধুতায় ও সাত্ত্বিক গুণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে উদ্ধব ও অক্রূর শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌর্য্যে ও পরাক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারথী কর্ণ শ্রেষ্ঠ। অথচ অর্জুনকেই জগৎপ্রভু বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে অচলা জয়শ্রী এবং গাণ্ডীব প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র সমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারা ভারতের সহস্র সহস্র জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধাকে নিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্ন সাম্রাজ্য অর্জুনের পরাক্রমলব্ধ দানরূপে সংস্থাপন করিলেন; উপরন্তু তাঁহাকেই গীতোক্ত পরম জ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ণীত করিলেন। অর্জুনই মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কর্ম্মী, সেই কাব্যের প্রত্যেক অংশ তাঁহারই যশোকীর্তি ঘোষণা করে। ইহা পুরুষোত্তম বা মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত নহে। এই উৎকর্ষ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ফল। যিনি পুরুষোত্তমের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভরপূর্ব্বক কোনও দাবী না করিয়া স্বীয় শুভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, পাপ ও পুণ্যের

সমস্ত ভাব তাঁহাকে সমর্পণ করেন, নিজ প্রিয়কর্ম্মে আসক্ত না হইয়া তদাদিষ্ট কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ প্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া তৎপ্রেরিত বৃত্তি গ্রহণ করেন, নিজ প্রশংসিত গুণ সাগ্রহে আলিঙ্গন না করিয়া তদ্দত্ত গুণ ও প্রেরণা তাঁহারই কার্য্যে প্রযুক্ত করেন; সেই শ্রদ্ধাবান অহঙ্কার-রহিত কর্ম্মযোগী পুরুষোত্তমের প্রিয়তম সখা ও শক্তির উত্তম আধার, তাঁহা দ্বারা জগতের বিরাট কার্য্য নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন হয়। ইসলাম-প্রণেতা মুহম্মদ এইরূপ যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্জুনও সেইরূপ আত্ম-সমর্পণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সেই চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা ও ভালবাসার কারণ। যিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দৃঢ় চেষ্টা করেন, তিনিই গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও সখা হইয়া তাঁহার ইহলোকের ও পর-লোকের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

অবস্থা

মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য ও উক্তির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে কি অবস্থায় সেই কার্য্য বা সেই উক্তি কৃত বা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ-কালে যখন শস্ত্রপ্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে—প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে—সেই সময়ে ভগবান গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে বিস্মিত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহা নিশ্চয় কবির অসাবধানতা বা বুদ্ধির দোষ। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে সেই স্থানে সেইরূপ

ভাবাপন্ন পাত্রকে দেশকালপাত্র বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন।

সময় যুদ্ধের প্রারম্ভকাল। যাঁহারা প্রবল কর্ম্মস্রোতে নিজ বীরত্ব ও শক্তি বিকাশ ও পরীক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কখনও গীতোক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। উপরন্তু যাঁহারা কোন কঠিন মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, যে মহাব্রতে অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক শত্রুবৃদ্ধি, অনেক পরাজয়ের আশঙ্কা স্বভাবতঃই হয়, সেই মহাব্রতের আচরণে যখন দিব্যশক্তি জন্মিয়াছে, তখন ব্রতের শেষ উদ্‌যাপনার্থে, ভগবানের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ এই জ্ঞান প্রকাশ হয়। গীতা কর্ম্মযোগকে ভগবানলাভের প্রতিষ্ঠা বিহিত করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ কর্ম্মেতেই জ্ঞান জন্মায়, অতএব গীতোক্ত মার্গের পথিক পথত্যাগ করিয়া দূরস্থ শান্তিময় আশ্রমে পর্ব্বতে বা নির্জন স্থানে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্য-পথেই কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ সেই স্বর্গীয় দীপ্তি জগৎ আলোকিত করে, সেই মধুর তেজোময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল, সেখানে শস্ত্রপাত হইতেছে। যাঁহারা এই পথে পথিক, এইরূপ কর্ম্মে অগ্রণী, প্রায়ই কোনও গুরুতর ফলোৎপাদক সময়ে, যখন কর্ম্মীর কর্ম্মানু-সারে অদৃষ্টের গতি এদিক না ওদিক চালিত হইবে, তখনই অকস্মাৎ তাঁহাদের যোগসিদ্ধি ও পরমজ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার জ্ঞান কর্ম্মবোধক নয়, কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাও সত্য

যে ধ্যানে, নির্জনে, স্বস্থ আত্মার মধ্যে জ্ঞানোন্মীলন হয়, সেইজন্য মনীষিগণ নির্জনে থাকিতে ভালবাসেন। কিন্তু গীতোক্ত যোগের পথিক মন-প্রাণ-দেহরূপ আধার এমনভাবে বিভক্ত করিতে পারেন যে, তিনি জনতায় নির্জনতা, কোলাহলে শান্তি, ঘোর কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরম নিবৃত্তি অনুভব করেন। তিনি অন্তরকে বাহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন না, বরং বাহ্যকে অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। সাধারণ যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়নপূর্ব্বক যোগাশ্রমে শরণ লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হন। সংসারই কর্ম্মযোগীর যোগাশ্রম। সাধারণ যোগী বাহ্যিক শান্তি ও নীরবতা অভিলাষ করেন, শান্তিভঙ্গে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। কর্ম্মযোগী অন্তরে বিশাল শান্তি ও নীরবতা ভোগ করেন, বাহ্যিক কোলাহলে সেই অবস্থা আরও গভীর হয়, বাহ্যিক তপোভঙ্গে সেই স্থির আন্তরিক তপঃ ভগ্ন হয় না, অবিচলিত থাকে। লোকে বলে, সমরোদ্যত সৈন্যের মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর, যোগপ্রভাবে সম্ভব হয়। সেই যোগবলে যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অন্তরে ও বাহিরে শান্তি বিরাজ করে, যুদ্ধের কোলাহল সেই দুইজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহাতে কর্ম্মোপযোগী আর এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত। যাঁহারা গীতোক্ত যোগ অনুশীলন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী অথচ কর্ম্মে অনাসক্ত। কর্ম্মের মধ্যেই আত্মার আন্তরিক আহ্বান শ্রবণে তাঁহারা কর্ম্মে বিরত হইয়া যোগমগ্ন ও তপস্যারত হন। তাঁহারা জানেন কর্ম্ম ভগবানের,

ফল ভগবানের, আমরা যন্ত্র, অতএব কর্ম্মফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হন না। ইহাও জানেন যে, কর্ম্মযোগের সুবিধার জন্য, কর্ম্মের উন্নতির জন্য, জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেই আহ্বান হয়। অতএব কর্ম্মে বিরত হইতে ভয় করেন না, জানেন যে, তপস্যায় কখনও বৃথা সময়ক্ষেপ হইতে পারে না।

পাত্রের ভাব, কর্ম্মযোগীর শেষ সন্দেহের উদ্রেক। বিশ্ব-সমস্যা, সুখদুঃখ সমস্যা, পাপপুণ্য সমস্যায় বিব্রত হইয়া অনেকে পলায়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া নিবৃত্তি, বৈরাগ্য ও কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় বুঝাইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছেন। যীশু, টলষ্টয় ইত্যাদি মানবজাতির সন্ততিস্থাপক বিবাহপদ্ধতি ও জগতের চিরন্তন নিয়ম যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। সন্ন্যাসী বলেন, কর্ম্মই অজ্ঞানসৃষ্ট, অজ্ঞান বর্জন কর, কর্ম্ম বর্জন কর, শান্ত নিষ্ক্রিয় হও। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মে বিলীন হও। তবে এই জগৎ কেন, এই সংসার কেন? ভগবান যদি থাকেন, কেন অর্ব্বাচীন বালকের ন্যায় এই বৃথা পণ্ডশ্রম, এই নীরস উপহাস আরম্ভ করিয়াছেন? আত্মাই যদি থাকেন, জগৎ মায়াই হয় এই আত্মাই বা কেন এই জঘন্য স্বপ্ন নিজ নির্ম্মল অস্তিত্বে অধ্যারোপ করিয়াছেন? নাস্তিক বলেন, ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অন্ধশক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। তাহাই বা কিরূপ কথা? শক্তি কাহার? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, কেনই বা অন্ধ উন্মত্ত? এই সকল

প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই, না খ্রীষ্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদী, না নাস্তিক, না বৈজ্ঞানিক; সকলেই এই বিষয়ে নিরুত্তর অথচ সমস্যা এড়াইয়া ফাঁকি দিতে সচেষ্ট। এক উপনিষদ ও তাহার অনুকূল গীতা এইরূপ ফাঁকি দিতে অনিচ্ছুক। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতা গীত হইয়াছে। ঘোর সাংসারিক কর্ম্ম, গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, আত্মীয়-হত্যা তাহার উদ্দেশ্য, সেই অযুত-প্রাণী-সংহারক যুদ্ধের প্রারম্ভে, অর্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গাণ্ডীব হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, কাতরস্বরে বলিতেছেন :—

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজযসি কেশব॥

"কেন আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?" উত্তরে সেই যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে বজ্রগম্ভীর স্বরে ভগবৎ-মুখ-নিঃসৃত মহাগীত উঠিয়াছে।—

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং।

*

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

*

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥

*

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ।।

*

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ।।

*

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ।।

*

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ।।

*

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ।।

*

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ।।

"অতএব তুমি কর্ম্মই করিয়া থাক, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তোমাকেই সেই কর্ম্ম করিতে হইবে।...যোগস্থ অবস্থায় আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর।...যাঁহার বুদ্ধি যোগস্থ, তিনি পাপ পুণ্য এই কর্ম্মক্ষেত্রেই অতিক্রম করেন, অতএব যোগার্থ সাধনা কর, যোগই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসাধন।...মানুষ যদি অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন

তিনি নিশ্চয় পবম ভগবানকে লাভ কবিবেন।...জ্ঞানপূর্ণ হৃদয়ে আমার উপর তোমাব সকল কর্ম্ম নিক্ষেপ কর, কামনা পবিত্যাগে, অহঙ্কাব পবিত্যাগে দুঃখবহিত হইযা যুদ্ধে লাগ। ...যিনি মুক্ত, আসক্তিবহিত, যাঁহাব চিত্ত সর্ব্বদা জ্ঞানে নিবাস করে, যিনি যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কবেন, তাঁহাব সকল কর্ম্ম বন্ধনেব কাবণ না হইয়া তখনই আমাব মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়।... সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বাবা আবৃত, সেই হেতু তাহারা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি কবিযা মোহে পতিত হয়।...আমাকে সর্ব্বলোকের মহেশ্বব যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মেব ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সখা ও বন্ধু বলিয়া জানিলে পরম শান্তিলাভ হয।...আমিই তোমার শত্রুগণকে বধ কবিয়াছি, তুমি যন্ত্র হইযা তাহাদেব সংহাব কব, দুঃখিত হইও না, যুদ্ধে লাগিযা যাও, বিপক্ষকে বণে জয় কবিবে।...যাঁহার অন্তঃকবণ অহংজ্ঞানশূন্য, যাঁহাব বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি যদি সমস্ত জগৎকে সংহাব কবেন, তথাপি তিনি হত্যা করেন নাই, তাঁহাব পাপরূপ কোন বন্ধন হয় না।”

প্রশ্ন এড়াইবাব ফাঁকি দিবাব কোন লক্ষণ নাই। প্রশ্নটি পরিস্কাবভাবে উত্থাপন কবা হইল। ভগবান কি, জগৎ কি, সংসাব কি, ধর্ম্মপথ কি, গীতায এই সকল প্রশ্নেব উত্তব সংক্ষেপে দেওয়া হইযাছে। অথচ সন্ন্যাসশিক্ষা নয, কর্ম্মশিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। ইহাতেই গীতাব সার্ব্বজনীন উপযোগিতা।

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—

হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ কি করিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনোস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

তখন রাজা দুর্য্যোধন রচিতব্যূহ পাণ্ডব-অনীকিনী দেখিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥

"দেখুন আচার্য্য, আপনাব মেধাবী শিষ্য দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা রচিতব্যূহ এই মহতী পাণ্ডবসেনা দেখুন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥

এই বিরাট সৈন্যে ভীম ও অর্জুনের সমান মহাধনুর্দ্ধর বীর-পুরুষ আছেন,—যুযুধান, বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ,

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও মহাপ্রতাপী কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরপুঙ্গব শৈব্য,

বিক্রমশালী যুধামন্যু ও প্রতাপবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সকলেই মহাযোদ্ধা।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

আমাদের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, যাঁহারা আমার সৈন্যের নেতা, তাঁহাদের নাম আপনার স্মরণার্থ বলিতেছি, লক্ষ্য করুন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।।৯।।

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ ও সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ,

এবং অন্য অনেক বীরপুরুষ আমার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।।১০।।

আমাদের এই সৈন্যবল একে অপরিমিত, তাহাতে ভীষ্ম আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাদের ওই সৈন্যবল পরিমিত, ভীমই তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আশাস্থল।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ।।১১।।

অতএব আপনারা যুদ্ধের যত প্রবেশস্থলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সৈন্য ভাগে অবস্থান করিয়া সকলে ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।"

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ।।১২।।

দুর্য্যোধনের প্রাণে হর্ষোদ্রেক করিয়া কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদে রণস্থল ধ্বনিত করিয়া মহাপ্রতাপভরে শঙ্খনিনাদ করিলেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ

সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ।।১৩।।

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদ্য অকস্মাৎ বাদিত হইল, রণস্থল উচ্চ-শব্দসঙ্কুল হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।।১৪।।

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত বিশাল রথে দণ্ডায়মান মাধব ও পাণ্ডু-পুত্র অর্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।

পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ।।১৫।।

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ।।১৬।।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ এবং নকুলসহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ।।১৭।।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ।।১৮।।

পরম ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরা-জিত যোদ্ধা সাত্যকি,

দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয়, সকলেই চারিদিক হইতে স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ং ॥১৯॥

সেই মহাশব্দ আকাশ ও পৃথিবী তুমুলরবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

তখন শস্ত্রনিক্ষেপ আরব্ধ হইবার পরে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

অর্জুন বলিলেন,—

"হে নিষ্পাপ, দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর, ততক্ষণ যুদ্ধস্পৃহায় অবস্থিত এই বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করি। জানিতে চাই, কাহাদের সহিত এই রণোৎসবে যুদ্ধ করিতে হইবে।

দেখি এই যুদ্ধপ্রার্থীগণ কাহারা, যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য করিবার কামনায় এইখানে সমাগত হইয়াছেন।"

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

গুড়াকেশের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপনপূর্ব্বক

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমুদয় নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ।"

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

সেই রণস্থলে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ, যত আত্মীয় ও স্বজন, দুই পরস্পরবিরোধী সৈন্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে এইরূপ অবস্থিত দেখিয়া কুন্তীপুত্র তীব্র কৃপায় আবিষ্ট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

অর্জুন বলিলেন,—

"হে কৃষ্ণ, এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমার দেহের অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে সমস্ত শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ উপস্থিত, গাণ্ডীব অবশ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, চর্ম্ম যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

আমি দাঁড়াইবার শক্তিরহিত হইলাম, মন যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে কেশব, অশুভ লক্ষণ সকল দেখিতেছি।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না; হে কৃষ্ণ, আমি জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ।।৩৩।।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ।।৩৪।।

বল, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ? কি লাভ ভোগে? কি প্রয়োজন জীবনে? যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয়,

তাঁহারাই জীবন ও ধন ত্যাগ করিয়া এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত, আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ,

মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, কুটুম্ব। হে মধুসূদন, ইঁহারা যদি আমাকে বধ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে বধ করিতে চাই না।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ।।৩৫ ।।

ত্রিলোকরাজ্যের লোভেও চাই না, পৃথিবীর আধিপত্য ত দূরের কথা। ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিয়া, হে জনার্দ্দন! আমাদের কি মনের সুখ হইতে পারে?

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ।।৩৬।।

ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদের বধ করিলে পাপই আমাদের মনে আশ্রয় পাইবে। অতএব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যখন

আমাদের আত্মীয়, তখন তাঁহাদিগকে সংহার করিতে আমরা অধিকারী নহি। হে মাধব, স্বজন বধে আমরা কিরূপে সুখী হইব?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ।।৩৭।।
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ।।৩৮।।

যদিও ইঁহারা লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রের অনিষ্টকরণে মহাপাপ বুঝেন না,

আমরা, জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝি, কেন আমাদের জ্ঞান হইবে না, এই পাপ হইতে আমরা কেন নিবৃত্ত হইব না?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ।।৩৯।।

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্মসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মনাশে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ।।৪০।।

অধর্ম্মের অভিভবে, হে কৃষ্ণ, কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হয়। কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হইলে বর্ণসঙ্কর হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ।।৪১।।

বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকগণের নরক প্রাপ্তির হেতু, কেননা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃলোক হইতে পতিত হন।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

কুলনাশকদের এই বর্ণসঙ্করোৎপাদক দোষ সকলের ফলে সনাতন জাতিধর্ম্ম সকল ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হয়।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দনঃ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

যাঁহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে, সেই মনুষ্যদের নিবাস নরকে নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহাই প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

ওহো! আমরা অতি মহৎ পাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, যে, রাজ্যসুখের লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যম করিতেছিলাম।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

যদি অশস্ত্র ও প্রতীকারে অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল।”

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

এই বলিয়া অর্জুন শোকোদ্বেগে কলুষিতচিত্ত হইয়া যুদ্ধকালে আরূঢ় শর ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে বসিয়া পড়িলেন।

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি

গীতা মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে উক্ত হয়। অতএব গীতার প্রথম শ্লোকে দেখি রাজা ধৃতরাষ্ট্র দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহাদের প্রথম চেষ্টা কি, বৃদ্ধ রাজা তাহা জানিতে উৎসুক। সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির কথা আধুনিক ভারতের ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বলিতাম অমুক লোক দূরদৃষ্টি (Clair-voyance) ও দূরশ্রবণ (Clair-audience) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য ও মহাবীরগণের সিংহনাদ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটি তত অবিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পারিত। আর ব্যাস-দেব যে এই শক্তি সঞ্জয়কে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আরও আমাদের গল্প বলিয়া উড়াইতে প্রবৃত্তি হয়। যদি বলিতাম যে একজন বিখ্যাত য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ অমুক লোককে স্বপ্না-বস্থাপ্রাপ্ত (Hypnotised) করিয়া তাঁহার মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই যাঁহারা পাশ্চাত্য hypnotism-এর কথা মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও পারিতেন। অথচ hypnotism যোগশক্তির নিকৃষ্ট ও বর্জনীয় অঙ্গ মাত্র। মানুষের মধ্যে

এমন অনেক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে পূর্ব্বকালের সভ্যজাতি সেই সকল জানিত ও বিকাশ করিত ; কিন্তু কলি-সম্ভূত অজ্ঞানের স্রোতে সেই বিদ্যা ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল আংশিকরূপে অল্প লোকের মধ্যে গুপ্ত ও গোপনীয় জ্ঞান বলিয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্মদৃষ্টি বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় আছে যাহা দ্বারা আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাতীত পদার্থ ও জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারি, সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, সূক্ষ্ম শব্দ শ্রবণ, সূক্ষ্ম গন্ধ আঘ্রাণ, সূক্ষ্ম পদার্থ স্পর্শ ও সূক্ষ্ম আহার আস্বাদ করিতে পারি। সূক্ষ্মদৃষ্টির চরম পরিণামকে দিব্যচক্ষু বলে, তাহার প্রভাবে দূরস্থ, গুপ্ত বা অন্যলোকগত বিষয় সকল আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য hypnotistএর অদ্ভুত শক্তিতে যদিও আমরা অবিশ্বাসী হই না, তবে অতুল্য জ্ঞানী ব্যাসদেবের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইব কেন? শক্তিমানের শক্তি পরের শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ও মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন, ইতো প্রভৃতি কর্ম্মবীর উপযুক্ত শক্তিসংক্রামণ দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সহকারী প্রস্তুত করিয়াছেন। অতি সামান্য যোগীও কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য বা কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য পরকে স্বীয় সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন—ব্যাসদেব ত জগতের শ্রেষ্ঠ

মনীষী ও অসামান্য যোগসিদ্ধ পুরুষ। বাস্তবিক, দিব্যচক্ষুর অস্তিত্ব আমাদের গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য হইবার কথা। আমরা জানি, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্রবণ করে না, নাসিকা আঘ্রাণ করে না, ত্বক্ স্পর্শ উপলব্ধি করে না, রসনা আস্বাদ করে না; মনই দর্শন করে, মনই শ্রবণ করে, মনই আঘ্রাণ করে, মনই স্পর্শ উপলব্ধি করে, মনই আস্বাদ করে। দর্শন শাস্ত্রে ও মনস্তত্ত্ববিদ্যায় এই সত্য অনেকদিন হইতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, hypnotismএ ইহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যে চক্ষু মুদ্রিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য যে কোন নাড়ী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে চক্ষু ইত্যাদি স্থূলেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রাপ্তির কেবল সুবিধাজনক উপায়, স্থূল শরীরে সনাতন অভ্যাসে বদ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের দাস হইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে কোন শারীরিক প্রণালী দ্বারা সেই জ্ঞান মনে পৌঁছাইতে পারি—যেমন অন্ধ স্পর্শ দ্বারা পদার্থের আকৃতির ও স্বভাবের নির্ভুল ধারণা করে। কিন্তু অন্ধের দৃষ্টি ও স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় যে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি মনের মধ্যে দেখে। ইহাকেই দর্শন বলে। প্রকৃতপক্ষে আমি সম্মুখস্থিত পুস্তক দর্শন করি না, সেই পুস্তকের যে প্রতিমূর্ত্তি আমার চক্ষুতে চিত্রিত হয়, তাহাই দেখিয়া মন বলে, পুস্তক দেখিলাম। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্তের দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে ও শ্রবণে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, পদার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কোন শারীরিক

প্রণালীর আবশ্যকতা নাই—সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিতে পারি। লণ্ডনে ঘরে বসিয়া সে সময় এডিনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, মনের মধ্যে তাহা দেখিলাম, এইরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ও দিব্যচক্ষুতে এই প্রভেদ আছে যে সূক্ষ্মদর্শী মনের মধ্যে অদৃষ্ট পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে, দিব্যচক্ষু দ্বারা আমরা মনের মধ্যে সেই দৃশ্য না দেখিয়া, শারীরিক চক্ষের সম্মুখে দেখি, চিন্তাস্রোতে সেই শব্দ না শুনিয়া শারীরিক কর্ণে শুনি। ইহার এক সামান্য দৃষ্টান্ত Crystalএ বা কালির মধ্যে সমসাময়িক ঘটনা দেখা। কিন্তু দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে এইরূপ উপকরণের কোন আবশ্যকতা নাই, তিনি এই শক্তিবিকাশে বিনা উপকরণে দেশ-কালের বন্ধন খুলিয়া অন্য দেশের ও অন্য কালের ঘটনা অবগত হইতে পারেন। দেশবন্ধন মোচনের প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি, কালবন্ধনও যে মোচন করা যায়, মানুষ যে ত্রিকালদর্শী হইতে পারে, তাহার এত বহু সংখ্যক ও সন্তোষজনক প্রমাণ এখনও জগতের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই। তবে যদি দেশবন্ধন মোচন করা সম্ভব হয়, কালবন্ধন মোচন অসম্ভব কথা বলা যায় না। যাহা হউক, এই ব্যাসদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমবেত ধার্ত্ত-রাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণকে চক্ষে দেখিলেন, দুর্য্যোধনের উক্তি, পিতামহ ভীষ্মের ভীম সিংহনাদ, পাঞ্চজন্যের কুরুধ্বংসঘোষক মহাশব্দ ও গীতার্থদ্যোতক কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ কর্ণে শ্রবণ করিলেন।

আমাদের মতে মহাভারতও রূপক নহে, কৃষ্ণ ও অর্জুনও কবির কল্পনা নহে, গীতাও আধুনিক তার্কিক বা দার্শনিকের সিদ্ধান্ত নহে। অতএব গীতার কোন কথা যে অসম্ভব বা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। এইজন্যই দিব্য চক্ষুপ্রাপ্তির কথায় এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

দুর্য্যোধনের বাক্‌কৌশল

সঞ্জয় সেই প্রথম যুদ্ধচেষ্টা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্য রচিত ব্যূহ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেন দ্রোণের নিকট গেলেন তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। ভীষ্মই সেনাপতি, যুদ্ধের কথা তাঁহাকেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু কূটবুদ্ধি দুর্য্যোধনের মনে ভীষ্মের উপর বিশ্বাস ছিল না। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনুরক্ত, হস্তিনাপুরের শান্ত্যনুমোদক দলের (peace party) নেতা; যদি পাণ্ডবে ধার্ত্তরাষ্ট্রেই যুদ্ধ হইত, ভীষ্ম কখনই অস্ত্রধারণ করিতেন না, কিন্তু কুরুদের প্রাচীন শত্রু ও সমকক্ষ সাম্রাজ্যলিপ্সু পাঞ্চালজাতি দ্বারা কুরুরাজ্য আক্রান্ত দেখিয়া কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্—সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে চিররক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন স্বয়ং অসুরপ্রকৃতি, রাগ-দ্বেষই তাঁহার সর্ব্বকার্য্যের প্রমাণ ও হেতু, অতএব কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রাণপ্রতিম

পাণ্ডবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহাব কবিবাব বল এই কঠিন তপস্বীর প্রাণে আছে, তাহা কখনও বিশ্বাস কবিতে পাবেন নাই। স্বদেশহিতৈষী পবামর্শেব সময স্বীয মত প্রকাশপূর্ব্বক স্বজাতিকে অন্যায় ও অহিত হইতে নিবৃত্ত কবিতে প্রাণপণ চেষ্টা কবিযাও সেই অন্যায ও অহিত একবাব লোক দ্বাবা স্বীকৃত হইলে স্বীয মত উপেক্ষা কবিযা অধর্ম্মযুদ্ধেও স্বজাতিবক্ষা ও শত্রুদমন কবেন, ভীষ্মও সেই পক্ষ অবলম্বন কবিযাছিলেন। এই ভাবও দুর্য্যোধনেব বোধাতীত। অতএব ভীষ্মেব নিকট উপস্থিত না হইযা দ্রোণকে স্মরণ কবিলেন। দ্রোণ ব্যক্তিগতভাবে পাঞ্চালবাজেব ঘোব শত্রু, পাঞ্চাল দেশেব বাজকুমাব ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু দ্রোণকে বধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ, অর্থাৎ দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এই ব্যক্তিগত বৈরভাবের কথা স্মবণ কবাইলে আচার্য্য শান্তিব পক্ষপাত পবিত্যাগ কবিয়া পূণ উৎসাহে যুদ্ধ কবিবেন। স্পষ্ট সেই কথা বলিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নেব নামমাত্র উল্লেখ কবিলেন তাহার পবে ভীষ্মকেও সন্তুষ্ট কবিবাব জন্য তাঁহাকে কুরুবাজ্যেব বক্ষক ও জয়ের আশাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। প্রথম বিপক্ষেব মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাব নাম উল্লেখ কবিলেন, পবে স্বসৈন্যেব কয়েকজন নেতাব নাম বলিলেন, সকলেব নহে, দ্রোণ ও ভীষ্মের নামই তাঁহার অভিসন্ধিসিদ্ধ্যর্থ যথেষ্ট, তবে সেই অভিসন্ধি গোপন কবিবাব জন্য আব চাবি-পাঁচটি নাম বলিলেন। তাহাব পবে বলিলেন, "আমার সৈন্য অতি বৃহৎ, ভীষ্ম আমার সেনাপতি, পাণ্ডবদেব সৈন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদেব আশাস্থল ভীমের বাহুবল,

অতএব আমাদের জয় হইবে না কেন ? তবে ভীষ্মই যখন আমাদের প্রধান ভরসা, তাঁহাকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সকলের উচিত. তিনি থাকিলে আমাদেব জয় অবশ্যম্ভাবী।" অনেকে 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের বিপরীত অর্থ করেন. তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, দুর্য্যোধনেব সৈন্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সেই সৈন্যের নেতাগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে কাহারও ন্যূন নহেন, আত্মশ্লাঘী দুর্য্যোধন কেন স্ববলের নিন্দা কবিয়া নিরাশা উৎপাদন কবিতে যাইবেন ? ভীষ্ম দুর্য্যোধনেব মনেব ভাব ও কথাব গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পাবিয়া তাঁহাব সন্দেহ অপোদনার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিলেন। দুর্য্যোধনের হৃদয়ে তাহাতে হর্ষোৎপাদন হইল। তিনি ভাবিলেন আমাব উদ্দেশ্য সাধিত হইযাছে. দ্রোণ ও ভীষ্ম দ্বিধা দূর করিয়া যুদ্ধ কবিবেন।

পূর্ব্ব সূচনা

যেই ভীষ্মেব গগনভেদী শঙ্খনাদে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল, তখনই সেই বিশাল কৌরব সেনার চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং রণোল্লাসে রথীগণ মাতিতে লাগিল। অপর-দিকে পাণ্ডবদের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাঁহাব সারথি শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের যুদ্ধাহ্বানের উত্তরস্বরূপ শঙ্খনাদ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচণ্ডীকে সৈন্যের হৃদয়ে জাগাইলেন। সেই মহান্ শব্দ পৃথিবী ও নভঃস্থলকে ধ্বনিত করিয়া যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ইহার

এই অর্থ নহে যে ভীষ্ম প্রভৃতি এই শব্দে ভীত হইলেন, তাঁহারা বীরপুরুষ, রণচণ্ডীর আহ্বানে ভীত হইবেন কেন? এই উক্তিতে কবি প্রথম অত্যুৎকট শব্দের শারীরিক বেগবান সঞ্চার বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন বজ্রনাদ অনেকবার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া যায় এইরূপ শ্রোতার বোধ হয়, তেমনই এই রণক্ষেত্রব্যাপী মহাশব্দের সঞ্চার হইল, আর এই শব্দ যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভাবী নিধনের ঘোষণা, যেই হৃদয়গুলি পাণ্ডবদের শস্ত্র বিদীর্ণ করিবে, পূর্ব্বেই তাঁহাদের শঙ্খনাদ সেইগুলি বিদীর্ণ করিয়া গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুই দিক হইতে শস্ত্রনিক্ষেপ হইতে লাগিল, এই সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যভাগে স্থাপন কর, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি, কে কে বিপক্ষ, কাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয় কর্ম্ম করিতে সমাগত হইয়াছেন, কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে।" অর্জুনের ভাব এই যে আমিই পাণ্ডবদের আশাস্থল, আমা দ্বারাই বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা হন্তব্য, অতএব দেখি ইহারা কাহারা। এই পর্য্যন্ত অর্জুনের সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ভাব রহিয়াছে, কৃপা কিম্বা দৌর্ব্বল্যের কোন চিহ্ন নাই। ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বিপক্ষের সৈন্যে উপস্থিত, সকলকে সংহার করিয়া অর্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অসপত্ন সাম্রাজ্য দিবার জন্য উদ্যোগী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে অর্জুনের মনে দৌর্ব্বল্য আছে, এখন চিত্ত পরিষ্কার না করিলে এমন কোনও সময়ে উহা অকস্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিয়া অধিকার করিতে পারে যে

পাণ্ডবদের বিশেষ অনিষ্ট, হয ত সর্ব্বনাশ হইবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এমন স্থানে বথ স্থাপন করিলেন যে ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদি অর্জুনেব প্রিয়জন তাঁহার সম্মুখে বহিলেন অথচ আব সকল কৌববপক্ষীয নৃপতিকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ. সমবেত কুরুজাতিকে দেখ। স্মরণ করিতে হয যে অর্জুন স্বয়ং কুরুজাতীয়, কুরুবংশেব গৌরব, তাঁহাব সকল আত্মীয. প্রিয়জন. বাল্যেব সহচরগণ সেই কুরুজাতীয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই তিনটি সামান্য কথাব গভীর অর্থ ও ভাব হৃদযঙ্গম হয়। তখন অর্জুন দেখিলেন যাঁহাদেব সংহার কবিযা যুধিষ্ঠিরেব অসপত্ন রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহাবা আব কেহ নন, নিজ প্রিয় আত্মীয, গুরু, বন্ধু. ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। দেখিলেন সমস্ত ভাবতেব ক্ষত্রিযবংশ পরস্পবের সহিত প্রিয সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ অথচ পরস্পবকে সংহাব কবিতে এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আগত।

বিষাদের মূল কারণ

অর্জুনের নির্ব্বেদের মূল কি? অনেকে এই বিষাদের প্রশংসা কবিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুমার্গপ্রদর্শক ও অধর্ম্মের অনুমোদক বলিয়া নিন্দা করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের শান্তিভাব, বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাভাব এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমভাবই উচচ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যুদ্ধ ও নরহত্যা পাপ, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাতক, তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। কিন্তু এই সকল আধুনিক ধারণা দ্বাপর যুগের মহাবীর পাণ্ডবেব মনেও

উঠে নাই ; অহিংসাভাব শ্রেষ্ঠ, বা যুদ্ধ, নবহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাপ বলিযা যুদ্ধে বিবত হওযা উচিত, এই চিন্তার কোনও চিহ্নও অর্জুনেব কথায় ব্যক্ত হয না। বলিলেন বটে, গুরুজনকে হত্যা কবা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কবা শ্রেয়স্কব, বলিলেন বটে যে বন্ধুবান্ধবেব হত্যায পাপ আমাদিগকে আশ্রয কবিবে, কিন্তু কর্ম্মেব স্বভাব দেখিযা এই কথা বলেন নাই, কর্ম্মেব ফল দেখিযা বলিলেন ; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব বিষাদ ভঞ্জনার্থ এই শিক্ষা দিযাছেন যে কর্ম্মেব ফল দেখিতে নাই, কর্ম্মেব স্বভাব দেখিযা সেই কর্ম্ম উচিত না অনুচিত স্থিব কবিতে হয। অর্জুনেব প্রথম ভাব এই যে ইঁহাবা আমাব আত্মীয, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যসহচর, সকলে স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসাব পাত্র, ইঁহাদেব হত্যায অসপত্ন রাজ্যভোগ কবিলে সেই বাজ্যভোগ কদাচ সুখপ্রদ হইতে পাবে না, বরং যাবজ্জীবন দুঃখ ও পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হয, বন্ধুবান্ধব-শূন্য পৃথিবীব বাজ্য কাহাবও বাঞ্ছনীয নহে। অর্জুনেব দ্বিতীয ভাব এই যে প্রিযজনকে হত্যা কবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, যাঁহাবা দ্বেষেব পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা কবা ক্ষত্রিযেব ধর্ম্ম। তৃতীয ভাব এই যে স্বার্থেব জন্য এইরূপ কর্ম্ম কবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়ের অনুচিত। চতুর্থ ভাব এই যে ভ্রাতৃবিরোধে ও ভ্রাতৃহত্যায কুলনাশ ও জাতিধ্বংস ঘটিবে, এইরূপ কুফল সৃষ্টি কুলবক্ষক ও জাতিবক্ষক ক্ষত্রিয়বীবেব পক্ষে মহাপাপ। এই চাবিটি ভাব ভিন্ন অর্জুনের বিষাদেব মূলে আর কোনও ভাব নাই। ইহা না বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার অর্থও বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত গীতার ধর্ম্মের বিরোধ ও সামঞ্জস্যের কথা পরে বলা হইবে। অর্জুনের কথার ভাব সূক্ষ্মবিচারে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রদর্শন করি।

বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ

অর্জুন প্রথম তাঁহার বিষাদের বর্ণনা করিলেন। স্নেহ ও কৃপার অকস্মাৎ বিদ্রোহে মহাবীর অর্জুন অভিভূত ও পরাস্ত, তাঁহার শরীরের সমস্ত বল এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গিয়াছে, অঙ্গ সকল অবসন্ন, দাঁড়াইবার শক্তি নাই, বলবান হস্ত গাণ্ডীব ধারণে অসমর্থ, শোকের উত্তাপে জ্বরের লক্ষণ ব্যক্ত, শরীরের দৌর্ব্বল্য হইয়াছে, ত্বক্ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, মুখ ভিতরে শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর তীব্রভাবে কম্পমান, মন যেন সেই আক্রমণে ঘুরিতেছে। এই ভাবের বর্ণনা পড়িয়া প্রথম কবির তেজস্বিনী কল্পনার অতিরিক্ত বিকাশ বলিয়া কেবল সেই কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া ক্ষান্ত হই, কিন্তু যদি সূক্ষ্মবিচারে নিরীক্ষণ করি, তখন এই বর্ণনার একটি গূঢ় অর্থ মনে উদয় হয়। অর্জুন পূর্ব্বেও কুরুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, অথচ এইরূপ ভাব কখনও হয় নাই, এখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আন্তরিক উৎপাত হইয়াছে। মনুষ্যজাতির অনেক অতিপ্রবল বৃত্তি ক্ষত্রিয় শিক্ষা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অর্জুনের হৃদয়তলে গুপ্তভাবে রহিয়াছে। নিগ্রহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না, বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সংযমে চিত্তশুদ্ধি হয়।

নিগৃহীত বৃত্তি ও ভাব সকল হয এই জন্মে, নহে পবজন্মে এক দিন চিত্ত হইতে উঠিয়া বুদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং জয় কবিয়া সমস্ত কর্ম্ম স্ববিকাশেব অনুকূল পথে চালায। এই হেতু, যে এই জন্মে দযাবান, সে অন্য জন্মে নিষ্ঠুব হয, যে এই জন্মে কামী ও দুশ্চবিত্র, সে অন্য জন্মে সাধু ও পবিত্রচেতা হয। নিগ্রহ না কবিয়া বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিব সাহায্যে বৃত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান কবিযা চিত্ত পবিষ্কাব কবিতে হয। ইহাকেই সংযম বলে। জ্ঞানেব প্রভাবে তমোভাবেব অপনোদন না হইলে সংযম অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনেব অজ্ঞান দূব কবিয়া সুপ্ত বিবেক জাগাইযা চিত্তশোধন কবিতে ইচ্ছুক। কিন্তু পরিহার্য্য বৃত্তি সকল চিত্ত হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক বুদ্ধিব সম্মুখে উপস্থিত না কবিলে বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান কবিবাব অবসব পায না, উপরন্তু যুদ্ধেই অন্তঃস্থ দৈত্য ও রাক্ষস বিবেক দ্বাবা হত হয, তখন বিবেক বুদ্ধিকে মুক্ত কবে। যোগেব প্রথম অবস্থায যত কুপ্রবৃত্তি চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া বহিযাছে, প্রবল বেগে বুদ্ধি আক্রমণ কবিযা অনভ্যস্ত সাধককে ভীতি ও শোকে বিহ্বল কবিযা ফেলে, ইহাকেই পাশ্চাত্য দেশে বলে শয়তানেব প্রলোভন, ইহাই মাবের আক্রমণ। কিন্তু সেই ভীতি ও শোক অজ্ঞানসম্ভূত, সেই প্রলোভন শযতানেব নহে, ভগবানেব। অন্তর্য্যামী জগৎগুরুই সেই সকল প্রবৃত্তি সাধককে আক্রমণ কবিবাব জন্য আহ্বান করেন, অমঙ্গলেব জন্য নহে, মঙ্গলের জন্য, চিত্তশোধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সশবীবে বাহ্যজগতে অর্জুনেব সখা ও সাবথি,

তেমনই তাঁহার মধ্যে অশবীবী ঈশ্বব ও অন্তর্য্যামী পুরুষোত্তম, তিনিই এই গুপ্তবৃত্তি ও ভাব প্রবল বেগে এক সময়ে বুদ্ধিব উপব নিক্ষেপ কবিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে বুদ্ধি ঘূর্ণ্যমান হইল এবং প্রবল মানসিক বিকাব তৎক্ষণাৎ স্থূল শবীবে কবিবর্ণিত লক্ষণ সকলে ব্যক্ত হইল। প্রবল অপ্রত্যাশিত শোক দুঃখেব এইরূপ শাবীবিক বিকাশ হয, তাহা আমবা জানি, তাহা মনুষ্য-জাতিব সাধাবণ অনুভবেব বহির্ভূত নহে। অর্জুনকে ভগবানেব বৈষ্ণবী মাযা অখণ্ড বলে এক মুহূর্ত্তে অভিভূত কবিল, সেই-জন্য এই প্রবল বিকাব। যখন অধর্ম্ম দযা প্রেম ইত্যাদি কোমল ধর্ম্মেব আকাব ধাবণ কবিযা অজ্ঞান জ্ঞানেব বেশে ছদ্মবেশী হইযা আসে, গাঢ় কৃষ্ণ তমোগুণ উজ্জ্বল ও বিশদ পবিত্রতাব ভাণ কবিযা বলে, আমি সাত্ত্বিক, আমি জ্ঞান, আমি ধর্ম্ম, আমি ভগবানেব প্রিয দূত, পুণ্যরূপী ও পুণ্যপ্রবর্ত্তক, তখন বুঝিতে হইবে যে ভগবানেব বৈষ্ণবী মাযা বুদ্ধিব মধ্যে প্রকাশ হইযাছে।

বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ

এই বৈষ্ণবী মায়ার মুখ্য অস্ত্র কৃপা ও স্নেহ। মানবজাতিব প্রেম ও ভালবাসা বিশুদ্ধ বৃত্তি নহে, শাবীবিক ও প্রাণকোষাগত বিকারেব বশে পবিত্র প্রেম ও দয়া কলুষিত ও বিকলাঙ্গ হয়। চিত্তই বৃত্তিব বাসস্থান, প্রাণ ভোগেব ক্ষেত্র, শবীব কর্ম্মেব যন্ত্র, বুদ্ধি চিন্তার রাজ্য। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সকলের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পরের অবিবোধী প্রবৃত্তি হয, চিত্তে ভাব ওঠে, শরীর দ্বারা

তদনুযাযী কর্ম্ম হয, বুদ্ধিতে তৎসম্পর্কীয় চিন্তা হয, প্রাণ সেই ভাব, কর্ম্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ কবে, জীব সাক্ষী হইয়া প্রকৃতিব এই আনন্দময ক্রীড়াদর্শনে আনন্দলাভ করে। অশুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ শাবীরিক বা মানসিক ভোগেব জন্য লালাযিত হইযা শবীবকে কর্ম্মযন্ত্র না কবিযা ভোগের উপায কবে, শবীব ভোগে আসক্ত হইযা বাব বাব শাবীবিক ভোগেব জন্য দাবী করে, চিত্ত শাবীবিক ভোগেব কামনায আক্রান্ত হইযা নির্ম্মল ভাব গ্রহণে অক্ষম হয, আব কলুষিত বাসনাযুক্ত ভাব চিত্তসাগব বিক্ষুব্ধ কবে, সেই বাসনাব কোলাহল বুদ্ধিকে অভিভূত কবিয়া বিব্রত কবে, বধির কবে, বুদ্ধি আব নির্ম্মল, শান্ত, অভ্রান্ত চিন্তা গ্রহণে সমর্থ হয না, চঞ্চল মনেব বশীভূত হইয়া ভ্রমে, চিন্তাবিভ্রাটে, অনৃতের প্রাবল্যে অন্ধ হয। জীবও এই বুদ্ধিভ্রংশে হৃতজ্ঞান হইযা সাক্ষীভাব ও নির্ম্মল আনন্দভাবে বঞ্চিত হইযা আধাবেব সহিত নিজ একত্ব স্বীকাব কবিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি চিত্ত, আমি বুদ্ধি এই ভ্রান্ত ধাবণায় শাবীবিক ও মানসিক সুখ দুঃখে সুখী ও দুঃখী হয। অশুদ্ধ চিত্ত এই বিভ্রাটের মূল, অতএব চিত্তশুদ্ধি উন্নতিব প্রথম সোপান। এই অশুদ্ধতা কেবল তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিকে কলুষিত কবিযা ক্ষান্ত হয় না, সাত্ত্বিক বৃত্তিকে কলুষিত কবে। অমুক লোক আমার শারীরিক বা মানসিক ভোগেব সামগ্রী, আমাব ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, তাহাব বিরহে আমার ক্লেশ হয়, ইহা অশুদ্ধ প্রেম, শরীর ও প্রাণ চিত্তকে কলুষিত কবিয়া নির্ম্মল প্রেমকে বিকৃত করিয়াছে

বুদ্ধিও সেই অশুদ্ধভাব ফলে ভ্রান্ত হইযা বলে, অমুক আমাব স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী, সখা, আত্মীয়, মিত্র তাহাকেই ভালবাসিতে হয়, সেই প্রেম পুণ্যময, সেই প্রেমের প্রতিকূল কার্য্য যদি কব, তাহা পাপ, ক্রূবতা, অধর্ম্ম। এইরূপ অশুদ্ধ প্রেমেব ফলে এমন বলবতী কৃপা হয যে প্রিযজনের কষ্ট, প্রিয়জনের অনিষ্ট অপেক্ষা ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেওয়াও শ্রেয়স্কব বোধ হয়, শেষে এই কৃপাব উপর আঘাত পড়ে বলিযা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিযা নিজ দৌর্ব্বল্যেব সমর্থন করি। এইরূপ বৈষ্ণবী মাযার প্রমাণ অর্জুনেব প্রত্যেক কথায় পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবী মায়ার ক্ষুদ্রতা

অর্জুনের প্রথম কথা, ইঁহারা আমার স্বজন, আত্মীয, ভাল-বাসার পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমাদেব কি হিত সাধিত হইবে? বিজেতার গর্ব্ব, রাজাব গৌবব, ধনীব সুখ? আমি এই সকল শূন্য স্বার্থ চাই না। লোকের বাজ্য, ভোগ, জীবন প্রিয় হয কেন? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছেন বলিয়া, আত্মীয় স্বজনকে সুখে বাখিতে পারিব বলিয়া, বন্ধু-বান্ধবেব সহিত ঐশ্বর্য্যের সুখে ও আমোদে দিন কাটাইতে পারিব বলিয়া এই সকল সুখ ও মহত্ত্ব লোভের বিষয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ ও সুখ চাই, তাঁহারাই আমাদের শত্রু হইয়া যুদ্ধে উপস্থিত। তাঁহারা আমাদিগকে বরং বধ করিতে প্রস্তুত তথাপি আমাদের সহিত রাজ্য ও সুখ একত্র ভোগ করিতে সঙ্কুচ

নন। আমাকে বধ করুন, আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন বধ করিতে পারিব না। যদি তাঁহাদের হত্যায় ত্রিলোকরাজ্য অধিকার করিতাম, তাহা হইলেও পারিতাম না, পৃথিবীর অসপত্ন সাম্রাজ্য কি ছার! স্থূলদর্শী লোক—

"ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"

এবং

"এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।"

এই উক্তিতে মোহিত হইয়া বলেন, "অহো! অর্জুনের কি মহান্ উদার নিঃস্বার্থ প্রেমময় ভাব। রুধিরাক্ত ভোগ ও সুখ অপেক্ষা পরাজয়, মরণ, চিরদুঃখ তাঁহার বাঞ্ছনীয়।" কিন্তু যদি অর্জুনের মনের ভাব পরীক্ষা করি, আমরা বুঝিতে পারি যে অর্জুনের ভাব অতি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলতা-প্রকাশক, ক্লীবোচিত। কুলের হিতার্থে বা প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা অনার্য্যের পক্ষে মহৎ উদার ভাব হইতে পারে, আর্য্যের পক্ষে তাহা মধ্যম ভাব, ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্বার্থত্যাগ করাই উত্তম ভাব। অপর পক্ষে কুলের হিতার্থে, প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অধম ভাব। ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্নেহ, কৃপা ও ভয় দমন করা প্রকৃত আর্য্যভাব। এই ক্ষুদ্রভাবের সমর্থনার্থ অর্জুন স্বজনহত্যার পাপ দেখাইয়া আবার বলিলেন, 'ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বধে আমাদের কি সুখ, কি মনস্তুষ্টি হইতে পারে?

তাহাবা আমাদেব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন. যদিও অন্যায় কবেন ও আমাদের শত্রুতা কবেন, রাজ্য অপহবণ করেন, সত্যভঙ্গ কবেন, তাঁহাদের বধে আমাদেব পাপই হইবে, সুখ হইবে না।" অর্জুন ভুলিয়া গিযাছিলেন যে তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছেন, নিজ সুখেব জন্য বা যুধিষ্টিবেব সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রবধে নিযুক্ত হন নাই, ধর্ম্মস্থাপন, অধর্ম্মনাশ, ক্ষত্রিযধর্ম্ম পালন, ভারতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত এক মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনা এই যুদ্ধেব উদ্দেশ্য। সমস্ত সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য কবিযাও এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি অর্জুনেব কর্ত্তব্য।

কুলনাশের কথা

কিন্তু স্বীয় দুর্ব্বলতাব সমর্থনে অর্জুন আর এক উচচতব যুক্তি আবিষ্কার কবিলেন, এই যুদ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হইবে, অতএব এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নহে, অধর্ম্মযুদ্ধ। এই ভ্রাতৃহত্যায মিত্রদ্রোহ, অর্থাৎ যাঁহাবা স্বভাবতঃ অনুকূল ও সহায়, তাঁহাদেব অনিষ্ট করা হয, উপরন্তু স্বীয় কুল অর্থাৎ যে কুরুনামক ক্ষত্রিয় বংশ ও জাতিতে উভয় পক্ষেব জন্ম হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধিত হয়। প্রাচীন কালে জাতি প্রাযই রক্তেব সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক মহান্ কুল বিস্তাব পাইযা জাতিতে পবিণত হইত, যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি ভারত-জাতিব অন্তর্গত কুল-বিশেষ এক-একটি বলশালী জাতি হইযাছিল। কুলের মধ্যে যে অন্তর্বিবোধ ও পবস্পরের অনিষ্টকরণ তাহাকেই অর্জুন মিত্র-

দ্রোহ নামে অভিহিত করিলেন। একে এই মিত্রদ্রোহ নৈতিক হিসাবে মহাপাপ, তাহাতে অর্থনীতিক হিসাবে এই মহান্ দোষ মিত্রদ্রোহে সন্নিবিষ্ট যে কুলক্ষয় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। সনাতন কুলধর্ম্মের সম্যক্ পালন কুলের উন্নতির ও অবস্থিতির কারণ, যে মহৎ আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা গার্হস্থ্যজীবনে ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষগণ স্থাপিত ও রক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, সেই আদর্শের হানি বা শৃঙ্খলার শিথিলীকরণ হইলে কুলের অধঃপতন হয়। কুল যতদিন সৌভাগ্যবান ও বলশালী হইয়া থাকে, ততদিন এই আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, কুল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তমোভাবের প্রসারণে মহান্ ধর্ম্মে শিথিলতা হয়, তাহার ফলে অরাজকতা, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবিষ্ট হয়, কুলের মহিলাগণ দুশ্চরিত্রা হয় এবং কুলের পবিত্রতা নষ্ট হয়, নীচজাতীয় ও নীচচরিত্রবিশিষ্ট লোকের ঔরসে মহান্ কুলে পুত্রোৎপাদন হয়। তাহাতে পিতৃপুরুষের প্রকৃত সন্ততিচ্ছেদে কুলহন্তাদের নরকপ্রাপ্তি হয় এবং অধর্ম্মের প্রসারে, বর্ণসঙ্কর-সম্ভূত নৈতিক অধোগতি ও নীচ গুণের বিস্তারে এবং অরাজকতা প্রভৃতি দোষে সমস্ত কুলও বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং নরকপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উভয়ই কুলনাশে নষ্ট হয়। জাতিধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত কুলসমষ্টিতে যে মহান্ জাতি হয়, সেই জাতির পুরুষপরম্পরায় আগত সনাতন আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা। তাহার পরে অর্জুন আবার তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত ও কর্ত্তব্যকর্ম্মবিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া যুদ্ধের সময়েই গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া

রথে বসিয়া পড়িলেন। কবি এই অধ্যাযেব শেষ শ্লোকে ইঙ্গিত কবিযা জানাইলেন যে শোকে তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রাট হইয়াছিল বলিয়া অর্জুন এইরূপ ক্ষত্রিয়েব অনুচিত অনার্য্য আচবণে কৃতসঙ্কল্প হইযাছিলেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যা

আমবা অর্জুনেব কুলনাশবিষযক কথার মধ্যে একটি অতি বৃহৎ ও উন্নত ভাবেব ছায়া দেখিতে পাই. এই ভাবের সহিত যে গুরুতব প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, তাহাব আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্ত্তার পক্ষে অতিশয প্রযোজনীয়। অথচ আমরা যদি কেবল গীতার আধ্যাত্মিক অর্থ অন্বেষণ করি, আমাদেব জাতীয, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত সাংসারিক কর্ম্ম ও আদর্শ হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মেব সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ কবি, সেই ভাব ও সেই প্রশ্নেব মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিব এবং গীতোক্ত ধর্ম্মেব সর্ব্বব্যাপী বিস্তার সঙ্কুচিত করিব। শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহারা গীতাব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, তাঁহারা সংসাবপবাঙ্মুখ দার্শনিক অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ জ্ঞানী বা ভক্ত ছিলেন, গীতায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ভাব খুঁজিয়া যাহা প্রযোজনীয়, তাহাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যাঁহারা এক আধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী তাঁহাবাই গীতার গূঢ়তম শিক্ষার অধিকারী। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ও কর্ম্মী ছিলেন, গীতার পাত্র অর্জুন ভক্ত ও কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। একটি মহৎ

বাজনীতিক সংঘর্ষ গীতাপ্রচাবেব কাবণ, সেই সংঘর্ষে অর্জুনকে মহৎ রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিব যন্ত্র ও নিমিত্ত রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গীতাব উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রই শিক্ষাস্থল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ বাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ধর্ম্মবাজ্য সংস্থাপন তাঁহাব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অর্জুনও ক্ষত্রিয় বাজকুমাব, বাজনীতি ও যুদ্ধ তাঁহাব স্বভাবনিবত কর্ম্ম। গীতাব উদ্দেশ্য বাদ দিযা, গীতার বক্তা, পাত্র ও প্রচাবেব কাবণ বাদ দিয়া গীতাব ব্যাখ্যা কবা চলিবে, কেন ?

মানব-সংসারের পাঁচটি মুখ্য প্রতিষ্ঠা চিবকাল বর্ত্তমান—ব্যক্তি, পবিবার, বংশ, জাতি, মানবসমষ্টি। এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠার উপব ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মেব উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবৎ-প্রাপ্তিব দুই মার্গ, বিদ্যাকে আযত্ত করা এবং অবিদ্যাকে আয়ত্ত কবা, দুইটিই আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্দর্শনেব উপায। বিদ্যাব মার্গ ব্রহ্মেব অভিব্যক্তি অবিদ্যামষ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ কবিযা সচ্চিদানন্দ লাভ বা পবব্রহ্মে লয। অবিদ্যার মার্গ সর্ব্বত্র আত্মা ও ভগবানকে দর্শন করিযা জ্ঞানমষ মঙ্গলময় শক্তিময় পরমেশ্বরকে বন্ধু, প্রভু, গুরু, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, দাস, প্রেমিক, পতি, পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়া। শান্তি বিদ্যার উদ্দেশ্য, প্রেম অবিদ্যাব উদ্দেশ্য। কিন্তু ভগবানেব প্রকৃতি বিদ্যাবিদ্যাময়ী। আমরা যদি কেবল বিদ্যাব মার্গ অনুসবণ কবি বিদ্যামষ ব্রহ্ম লাভ কবিব, যদি কেবল অবিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি অবিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিকেই যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই

সম্পূর্ণভাবে বাসুদেবকে লাভ করেন; তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। যাঁহারা বিদ্যার শেষ লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। ঈশা উপনিষদে এই মহান্ সত্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যাযাং রতাঃ ॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়ান্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

"যাঁহারা অবিদ্যার উপাসক হন, তাঁহারা অন্ধ অজ্ঞানরূপ তমঃ মধ্যে প্রবেশ করেন। যে ধীর জ্ঞানিগণ আমাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে বিদ্যারও ফল আছে, অবিদ্যারও ফল আছে, সেই দুই ফল স্বতন্ত্র। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতময় পুরুষোত্তমের আনন্দ ভোগ করেন।"

সমস্ত মানবজাতি অবিদ্যা ভোগ করিয়া বিদ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন. ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকাশ। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সাধক, যোগী, জ্ঞানী. ভক্ত, কর্ম্মযোগী, তাঁহারা এই মহৎ অভিযানের

অগ্রগামী সৈন্য, দূর গন্তব্যস্থানে ক্ষিপ্রগতিতে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসেন ও মানবজাতিকে সুসংবাদ শ্রবণ করান, পথ প্রদর্শন করেন, শক্তি বিতরণ করেন। ভগবানের অবতার ও বিভূতি আসিয়া পথ সুগম করেন, অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন, বাধা বিনাশ করেন। অবিদ্যায় বিদ্যা, ভোগে ত্যাগ, সংসারে সন্ন্যাস আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, ভগবানে জগৎ, জগতে ভগবান, এই উপলব্ধি আসল জ্ঞান, ইহাই মানবজাতির গন্তব্যস্থানে গমনের নির্দ্দিষ্ট পথ। আত্মজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দেহাত্মকবোধ, স্বার্থবোধ, সেই সঙ্কীর্ণতার মূল কারণ, অতএব পরকে আত্মবৎ দেখা উন্নতির প্রথম সোপান। মনুষ্য প্রথম ব্যক্তি লইয়া থাকে, নিজ ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, ভোগ, ও শক্তিবিকাশে রত থাকে। আমি দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল, সুখ, সৌন্দর্য্য, মনের ক্ষিপ্রতা আনন্দ, স্বচ্ছতা, প্রাণের তেজ, ভোগ, প্রফুল্লতা জীবনের উদ্দেশ্য ও উন্নতির চরমাবস্থা, মনুষ্যের এই প্রথম বা আসুরিক জ্ঞান। ইহারও প্রয়োজন আছে; দেহ, মন, প্রাণের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা প্রথম সাধন করিয়া তাহার পর সেই পূর্ণবিকশিত শক্তি পরের সেবায় প্রয়োগ করা উচিত। সেইজন্য আসুরিক শক্তিবিকাশ মানবজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থা; পশু, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ পর্য্যন্ত মনুষ্যের মনে, কর্ম্মে, চরিত্রে লীলা করে, বিকাশ পায়। তাহার পর মনুষ্য আত্মজ্ঞান বিস্তার করিয়া পরকে আত্মবৎ দেখিতে আরম্ভ করে,

পরার্থে স্বার্থ ডুবাইতে শিখে। প্রথম পরিবারকেই আত্মবৎ দেখে, স্ত্রীসন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, স্ত্রীসন্তানের সুখের জন্য নিজ সুখ জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে বংশ বা কুলকে আত্মবৎ দেখে, কুলরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে বলি দেয়, কুলের সুখ, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য নিজের ও স্ত্রীসন্তানের সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে জাতিকে আত্মবৎ দেখে, জাতিরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে কুলকে বলি দেয়,—যেমন চিতোরের রাজপুতকুল সমস্ত রাজপুতজাতির রক্ষার্থ বার বার স্বেচ্ছায় বলি হইল,—জাতির সুখ, গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের, স্ত্রীসন্তানদের, কুলের সুখ, গৌরব বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পর সমস্ত মানবজাতিকে আত্মবৎ দেখে, মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে, কুলকে, জাতিকে বলি দেয়,—মানবজাতির সুখ ও উন্নতির জন্য নিজের, স্ত্রীসন্তানদের, কুলের, জাতির, সুখ, গৌরব ও বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। এইরূপ পরকে আত্মবৎ দেখা, পরের জন্য নিজেকে ও নিজের সুখকে বলি দেওয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসূত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। য়ুরোপের নৈতিক উন্নতি এই পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন য়ুরোপীয়গণ ব্যক্তিকে পরিবারে ডুবাইতে, পরিবারকে কুলে ডুবাইতে শিখিয়াছিলেন, আধুনিক য়ুরোপীয়গণ কুলকে জাতিতে ডুবাইতে শিখিয়াছেন, জাতিকে মানবসমষ্টিতে ডুবান এখন তাঁহাদের মধ্যে কঠিন আদর্শ বলিয়া প্রচারিত ; টলষ্টয় ইত্যাদি মনীষিগণ

এবং সোশ্যালিষ্ট, এনার্কিষ্ট ইত্যাদি নব আদর্শের অনুমোদক দল এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসুক হইযাছেন। এই পর্য্যন্ত যুরোপের দৌড। তাঁহারা অবিদ্যার উপাসক, প্রকৃত বিদ্যা অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ভারতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভযই মনীষিগণ আয়ত্ত করিযাছেন। তাঁহারা জানেন অবিদ্যার পঞ্চপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ভগবান আছেন, তাঁহাকে না জানিতে পারিলে অবিদ্যাও জ্ঞাত হয় না, আযত্ত হয না। অতএব কেবল পরকে আত্মবৎ না দেখিয়া আত্মবৎ পরদেহেষু অর্থাৎ নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে সমানভাবে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন। নিজের উৎকর্ষ করিব, নিজের উৎকর্ষে পরিবারের উৎকর্ষ সাধিত হইবে ; পরিবারের উৎকর্ষ করিব, পরিবারের উৎকর্ষে কুলের উৎকর্ষ সাধিত হইবে ; জাতির উৎকর্ষ করিব, জাতির উৎকর্ষে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইবে , এই জ্ঞান আর্য্য সামাজিক ব্যবস্থার ও আর্য্য শিক্ষার মূলে নিহিত। ব্যক্তিগত ত্যাগ আর্য্যের মজ্জাগত অভ্যাস, পরিবারের জন্য ত্যাগ, কুলের জন্য ত্যাগ, সমাজের জন্য ত্যাগ, মানবজাতির জন্য ত্যাগ, ভগবানের জন্য ত্যাগ। আমাদের শিক্ষায় যে দোষ বা ন্যূনতা লক্ষিত হয়, সেই দোষ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণের ফল, যেমন, জাতিকে সমাজের মধ্যে দেখি, সমাজের হিতে ব্যক্তির ও পরিবারের হিত ডুবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির রাজনীতিক জীবনবিকাশ আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গ বলিয়া গৃহীত

ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই শিক্ষা আমদানী করিতে হইল। অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, গীতায়, রাজপুতানার ইতিহাসে, রামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা আমাদের স্বদেশেই ছিল। অতিরিক্ত বিদ্যা-উপাসনায়, অবিদ্যা-ভয়ে আমরা সেই শিক্ষা বিকাশ করিতে পারি নাই. সেই দোষে তমাভিভূত হইয়া জাতিধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া কঠিন দাসত্বে, দুঃখে, অজ্ঞানে পড়িলাম. অবিদ্যাও আয়ত্ত করিতে পারি নাই, বিদ্যাও হারাইতে বসিয়াছিলাম। ততো ভুয ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য

কুল ও জাতি মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশে ভিন্ন হয়, প্রাচীনকালে সেই ভিন্নতা ভারতে ও অন্য দেশেও এত পরিস্ফুট হয় নাই। কয়েকটি বড় বড় কুলের সমাবেশে একটি জাতি হইয়া দাঁড়াইত। এই ভিন্ন ভিন্ন কুল হয় এক-পূর্ব্ব-পুরুষের বংশধর. নয় ভিন্ন-বংশজাত হইলেও প্রীতিসংস্থাপনে এক বংশজাত বলিয়া গৃহীত। সমস্ত ভারত এক বড় জাতি হয় নাই, কিন্তু যে বড় বড় জাতি সমস্ত দেশ ছাইয়া বিরাজ করিত, তাহাদের মধ্যে এক সভ্যতা, এক ধর্ম্ম, এক সংস্কৃত ভাষা এবং বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। তথাপি প্রাচীনকাল হইতে একত্বের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল, কখনও কুরু, কখনও পাঞ্চাল, কখনও কোশল, কখনও মগধ জাতি দেশের নেতা বা

সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া সাম্রাজ্য করিত, কিন্তু প্রাচীন কুলধর্ম্ম ও কুলের স্বাধীনতাপ্রিয়তা একত্বের এমন প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিত যে সেই চেষ্টা কখন চিরকাল টিঁকিতে পারে নাই। ভারতে এই একত্বের চেষ্টা, অসপত্ন সাম্রাজ্যের চেষ্টা পুণ্যকর্ম্ম এবং রাজার কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। এই একত্বের স্রোত এত প্রবল হইযাছিল যে চেদিরাজ শিশুপালের ন্যায় তেজস্বী ও দুরন্ত ক্ষত্রিযও যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যস্থাপনে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া যোগদান করিতে সম্মত হইযাছিলেন। এইরূপ একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পূর্ব্বেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধর্ম্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যের প্রধান বাধা গর্ব্বিত ও তেজস্বী কুরুবংশ। কুরুজাতি অনেকদিন হইতে ভারতের নেতৃস্থানীয় জাতি ছিল, ইংরাজিতে যাহাকে hegemony বলে অর্থাৎ অনেক সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব, তাহাতে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল। যতদিন এই জাতির বল ও গর্ব্ব অক্ষুণ্নভাবে থাকিবে, ভারতে কখন একত্ব স্থাপিত হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। অতএব তিনি কুরুজাতির ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বিস্মৃত হন নাই ; যাহা ধর্ম্মতঃ কাহারও প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে

বঞ্চিত করা অধর্ম্ম বলিয়া কুরুজাতির যে ন্যায়তঃ রাজা ও প্রধান, সেই যুধিষ্ঠিরকে ভাবী সম্রাটপদে নিযুক্ত করিবার জন্য মনোনীত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম ধার্ম্মিক, সমর্থ হইয়াও স্নেহের বশে নিজের প্রিয় যাদবকুলকে কুরুজাতির স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবহেলা করিয়া নিজ প্রিয়তম সখা অর্জুনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু কেবল বয়স বা পূর্ব্ব অধিকার দেখিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়, গুণ ও সামর্থ্যও দেখিতে হয়। রাজা যুধিষ্ঠির যদি অধার্ম্মিক, অত্যাচারী বা অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য পাত্রকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেন। যুধিষ্ঠির যেমন বংশক্রমে, ন্যায্য অধিকারে ও দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মে সম্রাট হইবার উপযুক্ত, তেমনই গুণেও সেই পদের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা তেজস্বী ও প্রতিভাবান অনেক বড় বড় বীর নৃপতি ছিলেন, কিন্তু কেবল বলে ও প্রতিভায় কেহ রাজ্যের অধিকারী হন না। রাজা ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, প্রকৃতি-রঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্ম্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্ম্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যূনতা ছিল, তাঁহার বীর ভ্রাতৃদ্বয় ভীম ও অর্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। পঞ্চ-পাণ্ডবের তুল্য পরাক্রম রাজা বা বীরপুরুষ সমকালীন ভারতে ছিল না। অতএব জরাসন্ধবধে কণ্টক উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের

পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক ও রাজনীতিবিদ্। দেশের ধর্ম্ম, দেশের প্রণালী, দেশের সামাজিক নিয়মের ভিতরে কর্ম্ম করিয়া যদি তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ধর্ম্মের হানি, সেই প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ, সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন কেন? বিনা কারণে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব করা দেশের অহিতকর হয়। সেই হেতু প্রথমে পুরাতন প্রণালী রক্ষা করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দেশের প্রাচীন প্রণালীর এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেষ্টা সফল হইলেও সে ফল স্থায়ী হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা ছিল। যাঁহার সামরিক বলবৃদ্ধি আছে, তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধর ক্ষীণতেজ হইবামাত্র সেই মুকুট মস্তক হইতে আপনি খসিয়া পড়ে। যে তেজস্বী বীরজাতিসকল তাহার পিতার বা পিতামহের বশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিজয়ীর পুত্রের বা পৌত্রের অধীনতা স্বীকার করিবেন কেন? বংশগত অধিকার নহে, রাজসূয় যজ্ঞই অর্থাৎ অসাধারণ বলবীর্য্য সেই সাম্রাজ্যের মূল, যাঁহার অধিক বলবীর্য্য তিনিই যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইবেন। অতএব সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব পাইবার কোন আশা ছিল না, অল্পকাল প্রধানত্ব বা hegemonyই হইতে পারে। এই প্রথার আর একটি দোষ এই ছিল যে, নবসম্রাটের অকস্মাৎ বলবৃদ্ধি ও প্রধানত্বলাভে দেশের বলদৃপ্ত অসহিষ্ণু তেজস্বী

ক্ষত্রিয়গণের হৃদয়ে ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হয়; ইনি প্রধান হইবেন কেন, আমরা কেন হইব না, এই বিচার সহজে মনের মধ্যে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। যুধিষ্ঠিরের নিজকুলের ক্ষত্রিয়গণ এই ঈর্ষায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাঁহার পিতৃব্যের সন্তানগণ এই ঈর্ষার উপর নির্ভর করিয়া কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিলেন। দ্বেষের প্রণালীর দোষ অল্পদিনেই ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধার্ম্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ্। তিনি কখনও সদোষ, অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি তাঁহার যুগের প্রধান বিপ্লবকারী। রাজা ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিবার সময় সমকালীন পুরাতন মতের অনেক ভারতবাসীর আক্রোশ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচালিত যাদবকুল কখনও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বা ধর্ম্মকে বিকৃত করিতে কুণ্ঠিত হন না, যে কৃষ্ণের পরামর্শে কার্য্য করিবে, সেই নিশ্চয় অবিলম্বে পাপে পতিত হইবে। কেন না, পুরাতন রীতিতে আসক্ত রক্ষণশীলের মতে নূতন প্রয়াসই পাপ। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পতনে বুঝিলেন—বুঝিলেন কেন, তিনি ভগবান, পূর্ব্বে জানিতেন,—যে, দ্বাপরযুগের উপযোগী প্রথা কলিতে কখনও রক্ষণীয় নহে। অতএব তিনি আর সেইরূপ চেষ্টা করিলেন না, কলির উচিত ভেদদণ্ড প্রধান রাজনীতি অনুসরণ করিয়া গর্ব্বিত দৃপ্ত ক্ষত্রিয় জাতির বল নাশে ভাবী সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক

করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কুরুদেব পুরাতন সমকক্ষ শত্রু পাঞ্চালজাতিকে কুরুধ্বংসে প্রবৃত্ত করিলেন, যত জাতি কুরুদেব বিদ্বেষে যুধিষ্ঠিবের প্রেমে বা ধর্ম্মরাজ্য ও একত্বেব আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ষণ করিলেন এবং যুদ্ধেব উদ্যোগ করাইলেন। যে সন্ধির চেষ্টা হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আস্থা ছিল না, তিনি জানিতেন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলেও সে স্থায়ী হইতে পাবে না, তথাপি ধর্ম্মেব খাতিবে ও বাজনীতিব খাতিবে তিনি সন্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেব রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনেব জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধেব ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বিজেতা, দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহাবথী অর্জুন। অর্জুন শস্ত্রত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণেব বাজনীতিক পরিশ্রম পণ্ড হইত, ভারতের একত্ব সাধিত হইত না, দেশেব ভবিষ্যতে অবিলম্বে ঘোব কুফল ফলিত।

ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ

অর্জুনেব সমস্ত যুক্তি কুলের হিত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজিত, জাতির হিতচিন্তা স্নেহবশে তাঁহার মন হইতে অপসারিত হইয়াছে। তিনি কুরুবংশের হিত ভাবিয়া ভারতের হিত বিস্মৃত হইয়াছেন, অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃবধ মহাপাপ, এ কথা সকলে জানে, কিন্তু

ভ্রাতৃপ্রেমের বশে জাতীয় অনর্থ সম্পাদনে সহায় হওয়া, জাতীয় হিতসাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ গুরুতর। অর্জুন যদি শস্ত্র-ত্যাগ করেন, অধর্ম্মের জয় হইবে, দুর্য্যোধন ভারতে প্রধান নৃপতি ও সমস্ত দেশের নেতা হইয়া জাতীয় চরিত্র ও ক্ষত্রিয়কুলের আচরণ স্বীয় কুদৃষ্টান্তে কলুষিত করিবেন, ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত কুলসকল স্বার্থ, ঈর্ষা ও বিরোধপ্রিয়তার প্রেরণায় পরস্পরকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইবে, দেশকে একত্রিত, নিয়ন্ত্রিত ও শক্তির সমাবেশে সুরক্ষিত করিবার কোন অসপত্ন ধর্ম্মপ্রণোদিত রাজশক্তি থাকিবে না, এই অবস্থায় যে বিদেশী আক্রমণ তখনও রুদ্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভারতের উপর পড়িয়া প্লাবিত করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, সে অসময়ে আসিয়া আর্য্য-সভ্যতা ধ্বংস করিয়া জগতে ভাবী হিতের আশা নির্ম্মূল করিত। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাশে দুই সহস্র বর্ষ পরে ভারতে যে রাজনীতিক উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তখনই আরম্ভ হইত।

লোকে বলে অর্জুন যে অনিষ্টের ভয়ে এই আপত্তি করিয়াছিলেন, সত্য সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সেই অনিষ্ট ফলিল। ভ্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কলি-প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ। এই যুদ্ধে ভীষণ ভ্রাতৃবধ হইল, ইহা সত্য। জিজ্ঞাস্য এই, আর কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইত? এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি-প্রার্থনার বিফলতা জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্চ গ্রামও ফিরিয়া পাইলে যুধিষ্ঠির

যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেন, সেইটুকু পদ রাখিবার স্থল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের দৃঢ় নিশ্চয় ছিল, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দিবেন না। যখন সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলের উপর নির্ভর করে, সেই যুদ্ধে ভ্রাতৃবধ হইবে বলিয়া মহৎ কর্ম্মে ক্ষান্ত হওয়ায় অধর্ম্ম হয়। পরিবারের হিত জাতির হিতে, জগতের হিতে ডুবাইতে হয়; ভ্রাতৃস্নেহে, পারিবারিক ভালবাসার মোহে কোটি কোটি লোকের সর্ব্বনাশ করা চলে না, কোটি কোটি লোকের ভাবী সুখ বা দুঃখমোচন বিনষ্ট করা চলে না, তাহাতে ব্যক্তির ও কুলের নরক-প্রাপ্তি হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইযাছিল, তাহাও সত্য কথা। এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ পাইল। কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা পাইযা থাকে, তাহা হইলে কুরুধ্বংসে ক্ষতি না হইয়া লাভই হইয়াছে। যেমন পারিবারিক ভালবাসার মাযা আছে, তেমনই কুলের উপর মায়া আছে। দেশভাইকে কিছু বলিব না, দেশবাসীর সঙ্গে বিরোধ করিব না, অনিষ্ট করিলেও, আততায়ী হইলেও, দেশের সর্ব্বনাশ করিলেও তিনি ভাই, স্নেহের পাত্র, নীরবে সহ্য করিব; আমাদের মধ্যে যে বৈষ্ণবী-মায়া-প্রসূত অধর্ম্ম ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অনেকের বুদ্ধিভ্রংশ করে, তাহা এই কুলের মায়ার মোহে উৎপন্ন। বিনা কারণে বা স্বার্থের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যকতার অভাবে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ করা অধর্ম্ম। কিন্তু যে

দেশভাই সকলেব মাকে প্রাণে বধ করিতে বা তাঁহাব অনিষ্ট কবিতে বদ্ধপরিকব, তাহার দৌরাত্ম্য নীববে সহ্য করিয়া সেই মাতৃহত্যা বা অনিষ্টাচরণকে প্রশ্রয দেওযা আবও গুরুতব পাতক। শিবাজী যখন মুসলমানেব পৃষ্ঠপোষক দেশভাইকে সংহার করিতে গেলেন, তখন যদি কেহ বলিতেন, আহা! কি কব, ইহাবা দেশভাই, নীববে সহ্য কর, মোগল মহাবাষ্ট্রদেশকে অধিকাব করে করুক, মাবাঠায মাবাঠায় প্রেম থাকিলেই হয়,—কথাটি কি নিতান্ত হাস্যকব বোধ হইত না? আমেরিকানবা যখন দাসত্বপ্রথা উঠাইবাব জন্য দেশে বিবোধসৃষ্টি ও অন্তঃস্থ যুদ্ধসৃষ্টি করিযা সহস্র সহস্র দেশভাইযেব প্রাণসংহাব করিলেন, তাঁহারা কি কুকর্ম্ম করিযাছিলেন? এমন হয যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিবোধ, দেশভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতিব হিত ও জগতেব হিতের একমাত্র উপায হয। ইহাতে কুলনাশেব আশঙ্কা যদি হয, তাহা হইলেও জাতিব হিত ও জগতেব হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পাবি না। অবশ্য যদি সেই কুলের বক্ষা জাতিব হিতেব জন্য আবশ্যক হয, সমস্যা জটিল হয। মহাভারতেব যুগে ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সকলে কুলকেই মনুষ্যজাতিব কেন্দ্র বলিয়া জানিত। সেইজন্যই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহাবা পুরাতন বিদ্যার আকর ছিলেন, পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ধর্ম্ম পাণ্ডবদেব দিকে, জানিতেন যে মহৎ সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সমস্ত ভাবতকে এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহাবা ইহাও বুঝিতেন যে কুলই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা

ও জাতির কেন্দ্র, কুলনাশে ধর্ম্মরক্ষা ও জাতিসংস্থাপন অসম্ভব। অর্জুনও সেই ভ্রমে পতিত হইলেন। এই যুগে জাতিই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজের কেন্দ্র। জাতিরক্ষা এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম, জাতিনাশ এই যুগের অমার্জনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয়ত জগতের বড় বড় জ্ঞানী ও কর্ম্মী জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লবকারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া জগতের হিতসাধন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল

প্রথম কৃপার আবেশে অর্জুন কুলনাশের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন, কেন না, এই বৃহৎ সৈন্যসমাবেশ দর্শনে কুলের চিন্তা, জাতির চিন্তা আপনিই মনে উঠে। বলা হইয়াছে, কুলের হিতচিন্তা সেইকালের ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন জাতির হিতচিন্তা আধুনিক মনুষ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কুলনাশে জাতির প্রতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই আশঙ্কা কি অমূলক ছিল? অনেকে বলে, অর্জুন যাহা ভয় করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ভারতের অবনতি ও দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মূল কারণ। তেজস্বী ক্ষত্রিয়-বংশের লোপে, ক্ষত্রতেজের হ্রাসে ভারতের বিষম অমঙ্গল হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বিদেশী মহিলা, যাঁহার শ্রীচরণে অনেক হিন্দু এখন শিষ্যভাবে আনতশির, এই বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে

ক্ষত্রিয়নাশে ইংরেজ-সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করাই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের ধারণা, যাঁহারা এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলেন, তাঁহারা বিষয়টি না তলাইয়া অতি নগণ্য রাজনীতিক তত্ত্বের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই রাজনীতিক তত্ত্ব ম্লেচ্ছবিদ্যা, অনার্য্য চিন্তাপ্রণালী-সম্ভূত। অনার্য্যগণ আসুরিক বলে বলীয়ান, সেই বলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মহত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া জানেন।

জাতীয় মহত্ত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, চতুর্ব্বর্ণের চতুর্ব্বিধ তেজেই সেই মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজ রাজসিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান, বিনয় ও পরহিত-চিন্তার মধুর সঞ্জীবনী সুধায় জীবিত করিয়া রাখে, ক্ষত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজরহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণসকলকে আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ। যদি ক্ষত্রিয়বংশের লোপ হয়, নূতন ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্ত্তব্য। ব্রহ্মতেজপরিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ দুর্দ্দান্ত উদ্দাম আসুরিক বলে পরিণত হইয়া প্রথম পরহিত বিনাশ করিতে চেষ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। রোমান কবি যথার্থ বলিয়াছেন, অসুরগণ স্বীয় বলাতিরেকে পতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। সত্ত্ব রজকে সৃষ্টি করিবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা করিবে, সাত্ত্বিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির

মঙ্গল সম্ভব। সত্ত্ব যদি রজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যদি সত্ত্বকে গ্রাস করে, তমঃপ্রাদুর্ভাবে বিজয়ী গুণ স্বয়ং পরাজিত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা হইতে পারে না, ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলে শূদ্র রাজা হইবে, ব্রাহ্মণ তামসিক হইয়া অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া শূদ্রের দাস হইবে, আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেষ্টতাকে পোষণ করিবে, স্বয়ং ম্লান হইয়া ধর্ম্মের অবনতির কারণ হইবে। নিঃক্ষত্রিয় শূদ্রচালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে আসুরিক বলের প্রভাবে ক্ষণিক উত্তেজনায় শক্তিসঞ্চার ও মহত্ত্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্র হয় দুর্ব্বলতা, গ্লানি ও শক্তিক্ষয় হইয়া দেশ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নয় রাজসিক বিলাস, দম্ভ ও স্বার্থের বৃদ্ধিতে জাতি অনুপযুক্ত হইয়া মহত্ত্বরক্ষায় অসমর্থ হয়, নয় অন্তর্বিরোধে, দর্নীতিতে, অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া শত্রুর সহজলভ্য শিকার হয়। ভারতের ও য়ুরোপের ইতিহাসে এই সকল পরিমাণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাভারতের সময়ে আসুরিক বলের ভারে পৃথিবী অস্থির হইয়াছিল। ভারতে এমন তেজস্বী পরাক্রমশালী প্রচণ্ড ক্ষত্রিয় তেজের বিস্তার পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হয় নাই, কিন্তু সেই ভীষণ বলের সদুপযোগ হইবার সম্ভাবনা অতিশয় কম ছিল। যাঁহারা এই বলের আধার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অসুরপ্রকৃতির —অহঙ্কার, দর্প, স্বার্থ স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের মজ্জাগত ছিল। যদি শ্রীকৃষ্ণ এই বল বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন না করিতেন,

তাহা হইলে যে তিন প্রকার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছি, তাহার একটি না একটি নিশ্চয়ই ঘটিত। ভারত অসময়ে ম্লেচ্ছের হাতে পড়িত। মনে রাখা উচিত পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটিযাছে, আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে ম্লেচ্ছদের প্রথম সফল আক্রমণ সিন্ধুনদীর অপর পার পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছে। অতএব অর্জ্জুন-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য এতদিন ব্রহ্মতেজ-অনুপ্রাণিত ক্ষত্রতেজের প্রভাবে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। তখনও সঞ্চিত ক্ষত্রতেজ দেশে এত ছিল যে, তাহার ভগ্নাংশই দুই সহস্র বর্ষ দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রম, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, রাজসিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতেজের বলে দেশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিযাছেন। সেই দিনই গুজরাট যুদ্ধে ও লক্ষ্মীবাইয়ের চিতায় তাহার শেষ স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক কার্য্যের সুফল ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল ভারতকে, জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য আবার পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল। সেই অবতার আবার লুপ্ত ব্রহ্মতেজ জাগাইয়া গেলেন, সেই ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজ সৃষ্টি করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্রতেজ কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রে নির্ব্বাপিত করেন নাই, বরং আসুরিক বল বিনাশ করিয়া ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা করিয়াছেন। আসুরিক বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃশক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহা সত্য। এইরূপ মহাবিপ্লব, অন্তর্বিরোধকে

উৎকট ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা উদ্দাম ক্ষত্রিয়কুল সংহার সর্ব্বদা অনিষ্টকর হয়। অন্তর্বিরোধে রোমান ক্ষত্রিয়-কুলনাশে ও রাজতন্ত্রস্থাপনে রোমের বিরাট সাম্রাজ্য অকাল-বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে শ্বেত ও রক্ত গোলাপের অন্তর্বিরোধে ক্ষত্রিয়কুলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড, অষ্টম হেন্‌রি ও রাণী এলিজাবেথ সুরক্ষিত পরাক্রমশালী বিশ্ববিজয়ী আধুনিক ইংলণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপে রক্ষা পাইল।

কলিযুগে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু অবনতি আনয়ন করিবার জন্য ভগবান কখন অবতীর্ণ হন নাই। ধর্ম্মরক্ষা, বিশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য অবতার। বিশেষতঃ কলিযুগেই ভগবান পূর্ণভাবে অব-তীর্ণ হন, তাহার কারণ, কলিতে মানুষের অবনতির অধিক ভয়, অধর্ম্মবৃদ্ধি স্বাভাবিক, এতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য অধর্ম্ম-নাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, কলির গতি রুদ্ধ করিবার জন্য এই যুগে পুনঃ পুনঃ অবতার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, কলির রাজ্য আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছিল, তাঁহারই আবির্ভাবে ভীত হইয়া কলি নিজের রাজ্যে পদস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে পরীক্ষিত কলিকে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়া তাঁহারই যুগে তাঁহার একাধিপত্য স্থগিত করিয়া রাখিলেন। যে কলিযুগের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কলির সঙ্গে মানবের ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে ও চলিবে, সেই সংগ্রামের সহায় ও নায়ক-

রূপে ভগবানের অবতার ও বিভূতি কলিতে ঘন ঘন আসেন, সেই সংগ্রামের উপযোগী ব্রহ্মতেজ, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা ও রক্ষা করিতে ভগবান কলির মুখে মানবশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের রক্ষা মানবকল্যাণের ভিত্তি ও আশা-স্থল। ভগবান কুরুক্ষেত্রে ভারতের রক্ষা করিয়াছেন। সেই রক্তসমুদ্রে নূতন জগতের লীলাপদ্মে কালরূপী বিরাটপুরুষ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

মধুসূদন অর্জুনের কৃপার আবেশ, অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ও বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জুন ॥২॥

শ্রীভগবান বলিলেন,—

"হে অর্জুন! এই সঙ্কট সময়ে এই অনার্য্যের আদৃত স্বর্গপথরোধক অকীর্ত্তিকর মনের মলিনতা কোথা হইতে উপস্থিত?

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

হে পৃথাতনয়! হে শত্রুদমনে সমর্থ! ক্লীবত্ব আশ্রয় করিও না, ইহা তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই ক্ষুদ্র মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর, 'ওঠ।"

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জুন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার জন্য অন্তর্য্যামী তাঁহার প্রিয় সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে দূর করে। তিনি বলিলেন, দেখ, ইহা তোমার স্বপক্ষের সঙ্কটকাল, এখন যদি তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তাহাদের সম্পূর্ণ বিপদ ও বিনাশের সম্ভাবনা আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাগ তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের মনে উঠিবার কথা নয়, কোথা হইতে হঠাৎ এই দুর্ম্মতি? তোমার ভাব দুর্ব্বলতাপূর্ণ, পাপপূর্ণ। অনার্য্যগণ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, কিন্তু তাহা আর্য্যের অনুচিত, তাহাতে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্ন হয় এবং ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তির লোপ হয। তাহার পরে আরও মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিলেন। এই ভাব ক্লীবোচিত, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি জেতা, তুমি কুন্তির পুত্র, তুমি এইরূপ কথা বল? এই প্রাণের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর, ওঠ, তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদ্যোগী হও।

কৃপা ও দয়া

কৃপা ও দয়া স্বতন্ত্র ভাব, এমন কি কৃপা দয়ার বিরোধী ভাবও হইতে পারে। আমরা দয়ার বশে জগতের কল্যাণ করি, মানুষের দুঃখ, জাতির দুঃখ, পরের দুঃখ মোচন করি। যদি

নিজের দুঃখ বা ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ সহ্য না করিতে পারিয়া সেই কল্যাণ সাধনে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার দয়া নাই, কৃপারই আবেশ হইয়াছে। সমস্ত মানবজাতির বা দেশের দুঃখমোচন করিতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার। রক্তপাতেব ভযে, প্রাণীহিংসার ভয়ে সেই পুণ্যকার্য্যে বিবত হইলাম, জগতের, জাতির দুঃখের চিরস্থাযিতায় সাধ দিলাম, এই ভাব কৃপার। লোকের দুঃখে দুঃখী হইয়া দুঃখমোচনের যে প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলে। পবেব দুঃখচিন্তায় বা দুঃখদর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কৃপা। দয়া বলবানের ধর্ম্ম, কৃপা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। দয়ার আবেশে বুদ্ধদেব স্ত্রীপুত্র, পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধবকে দুঃখী ও হৃতসর্ব্বস্ব কবিয়া জগতের দুঃখমোচন করিতে নির্গত হইলেন। তীব্র দয়াব আবেশে উন্মত্ত কালী জগতময় অসুর সংহাব করিয়া পৃথিবীকে রক্তপ্লাবিত কবিয়া সকলের দুঃখমোচন করিলেন। অর্জুন কৃপার আবেশে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই ভাব অনার্য্য-প্রশংসিত, অনার্য্য-আচরিত। আর্য্য-শিক্ষা উদার, বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা। অনার্য্য মোহে পড়িয়া অনুদার ভাবকে ধর্ম্ম বলিয়া উদার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। অনার্য্য রাজসিকভাবে ভাবান্বিত হইয়া নিজের, প্রিয়জনের, নিজ পরিবার বা কুলের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে না, কৃপায় ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া নিজেকে পুণ্যবান বলিয়া গর্ব্ব করে, কঠোরব্রতী আর্য্যকে নিষ্ঠুর ও অধার্ম্মিক বলে। অনার্য্য তামসিক

মোহে মুগ্ধ হইয়া অপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি বলে, সকাম পুণ্যপ্রিয়তাকে ধর্ম্মনীতির উর্দ্ধ্বতম আসন প্রদান করে। দয়া আর্য্যের ভাব। কৃপা অনার্য্যের ভাব।

পুরুষ দয়ার বশে বীরভাবে পরের অমঙ্গল ও দুঃখকে বিনাশ করিবার জন্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী দয়ার বশে পরের দুঃখলাঘবের জন্য শুশ্রূষায়, যত্নে ও পরহিতচেষ্টায় সমস্ত প্রাণ ও শক্তি ঢালিয়া দেয়। যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্ত্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান—সে ক্লীব। এই ভাব ক্ষুদ্র, এই ভাব দুর্ব্বলতা। বিষাদ কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে বিষাদকে আশ্রয় দেয়, সে পাপকে আশ্রয় দেয়। এই চিত্তমলিনতা, এই অশুদ্ধ ও দুর্ব্বলভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উদ্যোগী হইয়া কর্ত্তব্যপালনে জগতের রক্ষা, ধর্ম্মের রক্ষা, পৃথিবীর ভার লাঘব করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মর্ম্ম।

*　　　*　　　*

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

অর্জুন বলিলেন,

"হে মধুসূদন, হে শত্রুনাশকারী, আমি কিরূপে ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়া সেই পূজনীয় গুরুজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

এই উদারচেতা গুরুজনকে বধ না করিয়া পৃথিবীতে ভিখারীর অবস্থা ভোগ করা শ্রেয়ঃ। গুরুজনকে যদি বধ করি, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হারাইয়া কেবল অর্থ ও কাম ভোগ করিব, সেও রুধিরাক্ত বিষয়ভোগ এবং পৃথিবীতেই ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয়, কোন্‌টি অধিক প্রার্থনীয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহাদিগকে বধ করিলে আমাদের জীবিত থাকিবার কোন ইচ্ছা থাকিবে না, তাঁহারাই বিপক্ষীয় সৈন্যের অগ্রভাগে উপস্থিত, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সৈন্যনায়ক।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয়-স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি বিমূঢ়, সেইজন্য তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, তুমি আমাকে কিসে শ্রেয়ঃ হইবে নিশ্চিতভাবে তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট শরণ লইলাম, আমাকে শিক্ষা দাও।

> ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
> যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
> অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
> রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

কেন না, পৃথিবীতে অসপত্ন রাজ্য এবং দেবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিলেও এই শোক আমার সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ শোষণ করিয়া লইবে, সেই শোকাপনোদনের কোন উপায় আমি দেখি না।"

অর্জুনের শিক্ষাপ্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উদ্দেশ্য অর্জুন বুঝিতে পারিলেন, তিনি রাজনীতিক আপত্তি উত্থাপন করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু আর যে যে আপত্তি ছিল, তাহার কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষার্থে শরণাগত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি স্বীকার করি আমি ক্ষত্রিয়, কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া মহৎ কার্য্যে বিরত হওয়া আমার পক্ষে ক্লীবত্বসূচক, অকীর্ত্তিজনক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু মনও মানে না, প্রাণও মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্যা

মহাপাপ, নিজ সুখের জন্য গুরুজনকে হত্যা করিলে অধর্ম্মে পতিত হইয়া ধর্ম্ম, মোক্ষ. পরলোক, যাহা বাঞ্ছনীয়, সকলই যাইবে। কামনা তৃপ্ত হইবে, অর্থস্পৃহা তৃপ্ত হইবে, কিন্তু সে কয়দিন? অধর্ম্মলব্ধ ভোগ প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহার পর অনির্ব্বচনীয় দুর্গতি হয়। আর যখন ভোগ করিবে, তখন সেই ভোগের মধ্যে গুরুজনের রক্তের আস্বাদ পাইয়া কি সুখ বা শান্তি হইবে? প্রাণ বলে. ইহাবা আমার প্রিয়জন, ইহাদের হত্যা কবিলে আমি আর এই জন্মে সুখভোগ করিতে পারিব না, বাঁচিতেও চাই না। তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য-ভোগ দাও বা স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যভোগ দাও, আমি কিন্তু শুনিব না। যে শোক আমাকে অভিভূত কবিবে, তাহা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে শিথিল ও অসমর্থ হইবে তখন তুমি কি ভোগ করিবে? আমার বিষম চিত্তের দীনতা উপস্থিত, মহান্ ক্ষত্রিয়-স্বভাব সেই দীনতায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার নিকট শরণ লইলাম। আমাকে জ্ঞান, শক্তি, শ্রদ্ধা দাও, শ্রেয়ঃপথ দেখাইয়া রক্ষা কর।"

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের পন্থা। ইহাকে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। যিনি ভগবানকে গুরু, প্রভু, সখা, পথপ্রদর্শক বলিয়া আর সকল ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া নিজ জ্ঞান,

কর্ম্ম ও সাধনার সমস্ত ভাব শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই গীতোক্ত যোগের অধিকারী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি যদি গুরুহত্যাও করিতে বল, ইহাকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া দাও, আমি তাহাই করিব। এই গভীর শ্রদ্ধার বলে অর্জুন সমসাময়িক সকল মহাপুরুষকে অতিক্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জুনের দুই আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাহার পরে গুরুর ভার গ্রহণ করিয়া আসল জ্ঞান দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত আপত্তিখণ্ডন, তাহার পরে গীতোক্ত শিক্ষার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আপত্তিখণ্ডনের মধ্যে কয়েকটি অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহা না বুঝিলে গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কয়েকটি কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আবার সেই গোবিন্দকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না" এবং নীরব হইয়া রহিলেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ হাস্য করিয়া দুই সেনার মধ্যস্থলে বিষণ্ণ অর্জুনকে এই উত্তর দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

শ্রীভগবান বলিলেন,—

"যাহাদের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক কর, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় তত্ত্বকথা লইয়া বাদ-বিবাদ করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

ইহাও নহে যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিবৃন্দ ছিল না, ইহাও নহে যে আমরা সকলে দেহ-ত্যাগের পরে আর থাকিব না।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

যেমন এই জীব-অধিষ্ঠিত দেহে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কালের গতিতে হয়, তেমনই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও কালের গতিতে হয়, তাহাতে স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী বিমূঢ় হন না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

মরণ কিছুই নয়, যে বিষয়স্পর্শে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সংস্কার সৃষ্ট হয়, সেই স্পর্শ সকল অনিত্য, আসে, যায়, সেই সকল অবিচলিত হইয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস কর।

যং হি ন ব্যথযন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

যে স্থিরবুদ্ধি পুরুষ এই স্পর্শসকল ভোগ করিয়াও ব্যথিত হন না, তৎসৃষ্ট সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই মৃত্যু জয় করিতে সক্ষম হন।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব হয় না, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না, তথাপি সৎ ও অসৎ দুইটির অন্ত হয়, ইহা তত্ত্বদর্শীগণ দর্শন করিয়াছেন।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥

কিন্তু যাহা এই সমস্ত দৃশ্যজগৎ নিজের মধ্যে বিস্তার করিয়াছেন, সেই আত্মার ক্ষয় হয় না, কেহ তাহার ধ্বংস করিতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

নিত্য দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহের অন্ত আছে, আত্মা অসীম ও অনশ্বর; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

যিনি আত্মাকে হন্তা বলেন, এবং যিনি দেহনাশে আত্মাকে নিহত বলিয়া বোঝেন, দুই জনই ভ্রান্ত, অজ্ঞ, এই আত্মা হত্যাও করে না, হতও হয় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার কখনও উদ্ভব হয় নাই এবং কখনও লোপ হইবে না। সে জন্মরহিত, সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে হত হয় না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্‌ ॥২১॥

যিনি ইহাকে নিত্য, অনশ্বর ও অক্ষয় বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কিরূপে কাহাকে হত্যা করেন বা করান?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ফেলিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপই জীব জীর্ণ দেহ ফেলিয়া অন্য নূতন দেহকে আশ্রয় করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ।।২৩।।

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন কবিতে পারে না, অগ্নি দহন কবিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বাযু শুষ্ক করিতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽযমদাহ্যোঽযমক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ।।২৪।।

আত্মা অচেছ্দ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য. অশোষ্য, নিত্য. সর্ব্বব্যাপী, স্থিব, অচল, সনাতন।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽযমবিকার্য্যোঽযমুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ।।২৫।।

আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য. বিকাবরহিত। তুমি আত্মাকে এইরূপ জানিযা শোক কবা পবিত্যাগ কব।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ।।২৬।।

আব তুমি যদি মনে কর জীব বাব বার জন্মায় ও মরে, তাহা হইলেও তাহার জন্য শোক কবা উচিত নয।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।।২৭।।

যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপরিহার্য্য পরিণাম, তাহার জন্য শোক করা অনুচিত।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভাবত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পবিদেবনা ।।২৮।।

সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়া থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, আবার অব্যক্ত হয়, এই স্বাভাবিক ক্রমে শোক করিবার কোনও কারণ নাই।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ।।২৯।।

আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ আত্মাকে জানিতে পাবেন নাই।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্ব ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।।৩০।।

আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, অতএব এই সকল প্রাণীব জন্য কখন শোক করা উচিত নহে।”

মৃত্যুর অসত্যতা

অর্জুনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসির ভাব প্রকাশ হইল, সেই হাসি রঙ্গময় অথচ প্রসনুতাপূর্ণ,—অর্জুনের ভ্রমে মানবজাতির পুরাতন ভ্রম চিনিয়া অন্তর্য্যামী হাসিলেন—সেই

ভ্রম শ্রীকৃষ্ণেরই মায়াপ্রসূত, জগতে অশুভ, দুঃখ ও দুর্ব্বলতা ভোগ ও সংযম দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্য তিনি মানবকে এই মায়ার বশীভূত করিয়াছেন। প্রাণের মমতা, মরণের ভয়, সুখ-দুঃখের অধীনত্ব, প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ, ইত্যাদি অজ্ঞান অর্জুনের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই মানবের বুদ্ধি হইতে দূর করিয়া জগৎকে অশুভমুক্ত করিতে হইবে, সেই শুভ কার্য্যের অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, গীতা প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। (কিন্তু প্রথম অর্জুনের মনে যে ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, মানবজাতির প্রতিনিধি, তাঁহাকেই গীতা প্রদর্শিত হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র; কিন্তু মানবজাতি এখনও গীতার অর্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, অর্জুনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যে শোক, দুঃখ ও কাতরতা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কলিযুগে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া আসিতেছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রেম আনয়ন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম দয়া আনয়ন করিয়া, ইসলামধর্ম্ম শক্তি আনয়ন করিয়া সেই দুঃখভোগ লাঘব করিতে আসিয়াছে। আজ কলিযুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, ভগবান আবার ভারতকে, কুরুজাতির বংশধরগণকে গীতা প্রদান করিতেছেন, যদি গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সুনিশ্চিত ফল।)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জুন, তুমি পণ্ডিতের ন্যায় পাপপুণ্য বিচার করিতেছ, জীবন-মরণের তত্ত্ব বলিতেছ, জাতির কল্যাণ-

অকল্যাণ কিসে হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় তোমার কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ। স্পষ্ট কথা বল, আমার হৃদয় দুর্ব্বল, শোকে কাতর, বুদ্ধি কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ; জ্ঞানীর ভাষায় অজ্ঞের ন্যায় তর্ক করিয়া তোমার দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শোক মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যমাত্রই মরণ ও বিচ্ছেদ অতি ভয়ঙ্কর, জীবন মহামূল্য, শোক অসহ্য, কর্ত্তব্য কঠোর, স্বার্থসিদ্ধি মধুর বুঝিয়া হর্ষ করে, দুঃখ করে, হাসে, কাঁদে, কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে কেহ জ্ঞানপ্রসূত বলে না। যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। জ্ঞানী কাহারও জন্য শোক করেন না,—না মৃত ব্যক্তির জন্য, না জীবিত ব্যক্তির জন্য। তিনি এই কথা জানেন—মরণ নাই, বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা অমর, আমরা চিরকাল এক, আমরা আনন্দের সন্তান, অমৃতের সন্তান, জীবনের মরণের সঙ্গ, সুখ দুঃখের সঙ্গে এই পৃথিবীতে লুকোচুরি খেলা করিতে আসিয়াছি—প্রকৃতির বিশাল নাট্যগৃহে হাসি কান্নার অভিনয় করিতেছি, শত্রু মিত্র সাজিয়া যুদ্ধ ও শান্তি, প্রেম ও কলহের রস আস্বাদন করিতেছি। এই যে অল্পকাল বাঁচিয়া থাকি, কাল, পরশ্ব দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব জানি না, ইহা আমাদের অনন্তক্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত মাত্র, ক্ষণিক খেলা, কয়েকক্ষণের ভাব। আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকিব—সনাতন, নিত্য, অনশ্বর—প্রকৃতির

ঈশ্বর আমরা, জীবন-মরণের কর্ত্তা, ভগবানের অংশ, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকারী। যেমন দেহের বাল্য, যৌবন, জরা, তেমনই দেহান্তরপ্রাপ্তি, মরণ নামমাত্র, নাম শুনিয়া আমরা ভয় পাই, দুঃখিত হই, বস্তু যদি বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না, দুঃখিতও হইতাম না। আমরা যদি বালকের যৌবনপ্রাপ্তিকে মরণ বলিয়া কাঁদিয়া বলিতাম, আহা আমাদের সেই প্রিয় বালক কোথায় গেল, এই যুবাপুরুষ সেই বালক নহে, আমার সোনার-চাঁদ কোথায় গিয়াছে—আমাদের ব্যবহারকে সকলে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিত; কেননা, এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, বালকদেহে ও যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থির ভাবে রহিয়াছেন। জ্ঞানী, সাধারণ মানুষের মরণে ভয় ও মরণে দুঃখ দেখিয়া তাহার ব্যবহার ঠিক সেইভাবে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিয়া দেখেন, কেননা দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। অমৃতের সন্তান আমরা, কে মরে, কে মারে? মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, মৃত্যু ফাঁকা আওয়াজ, মৃত্যু ভ্রম, মৃত্যু নাই।

মাত্রা

পুরুষ অচল, প্রকৃতি চল। চল প্রকৃতির মধ্যে অচল পুরুষ অবস্থিত। প্রকৃতিস্থ পুরুষ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদ করে, স্পর্শ করে, তাহাই ভোগ

করিবার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় কণে। আমরা দেখি রূপ, শুনি শবদ, আঘ্রাণ করি গন্ধ, আস্বাদ করি রস, অনুভব কবি স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রই ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিশেষ বিষয় সংস্কাব। বুদ্ধিব বিষয় চিন্তা। পঞ্চ তন্মাত্র এবং সংস্কার ও চিন্তা অনুভব ও ভোগ করিবাব জন্য পুরুষ-প্রকৃতিব পরস্পব সম্ভোগ ও অনন্ত ক্রীড়া। এই ভোগ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ নাই, পুরুষেব চিবন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ আছে, শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, হর্ষ-শোক ইত্যাদি দ্বন্দ্ব অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতাব কাবণ। কামীমাত্রেই অশুদ্ধ, যে নিষ্কাম, সে শুদ্ধ। কামনায রাগ ও দ্বেষ সৃষ্ট হয়, বাগদ্বেষেব বশে পুরুষ বিষযে আসক্ত হয়, আসক্তির ফল বন্ধন। পুরুষ বিচলিত ও ও বিক্ষুব্ধ, এমন কি ব্যথিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হইযাও আসক্তির অভ্যাস-দোষে তাহাব ক্ষোভ, ব্যথা বা যন্ত্রণাব কাবণ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়।

সমভাব

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম আত্মার নিত্যতার উল্লেখ করিয়া পরে অজ্ঞানের বন্ধন শিথিল করিবার উপায় দেখাইলেন। মাত্রা অর্থাৎ বিষয়ের নানারূপ স্পর্শ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের কারণ। এই স্পর্শসকল অনিত্য, তাহাদের আরম্ভও আছে, অন্তরও আছে,

অনিত্য বলিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য বস্তুতে যদি আসক্ত হই, তাহার আগমনে হৃষ্ট হই, তাহাব নাশে বা অভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। অজ্ঞানে অনশ্বর আত্মাব সনাতন ভাব ও অব্যয় আনন্দ আচ্ছন্ন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব ও বস্তুতে মত্ত হইয়া থাকি, তাহার নাশের দুঃখে শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এইরূপ অভিভূত না হইয়া যে বিষয়ের স্পর্শসকল সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিয়াও সুখ-দুঃখে, শীতোষ্ণে, প্রিয়াপ্রিয়ে, মঙ্গলামঙ্গলে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ ও শোক অনুভব না করিয়া সমানভাবে প্রফুল্লচিত্তে হাস্যমুখে গ্রহণ করিতে পারে, সে পুরুষ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, অজ্ঞানের বন্ধন কাটিয়া সনাতন ভাব ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়,—অমৃতত্বায কল্পতে।

সমতার গুণ

এই সমতা গীতার প্রথম শিক্ষা। সমতাই গীতোক্ত সাধনের প্রতিষ্ঠা। গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায ভাবত হইতে এই সমতার শিক্ষা লাভ কবিযা য়ুরোপে সমতাবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক এপিকুরস শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত শিক্ষার আর এক দিক ধরিয়া শান্তভোগের শিক্ষা, Epicureanism বা ভোগবাদ, প্রচার করিলেন। এই দুই মত, সমতাবাদ ও ভোগবাদ প্রাচীন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নৈতিক মত বলিয়া জ্ঞাত ছিল এবং আধুনিক য়ুরোপেও নব আকার ধারণ করিয়া Puritanism ও Paganism-এর

চির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতা-বাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই কথা। সমতা কারণ, শুদ্ধ ভোগ কার্য্য। সমতায় আসক্তি মরে, রাগদ্বেষ প্রশমিত হয়, আসক্তি নাশে এবং রাগদ্বেষ প্রশমনে শুদ্ধতা জন্মায়। শুদ্ধ পুরুষের ভোগ কামনা ও আসক্তিরহিত, অতএব শুদ্ধ। ইহাতেই সমতার গুণ যে সমতার সহিত আসক্তি ও রাগদ্বেষ এক আধারে থাকিতে পারে না। সমতাই শুদ্ধির বীজ।

গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় এই ভুল করিলেন যে তাঁহারা দুঃখ-জয়ের প্রকৃত উপায় বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা দুঃখ নিগ্রহ করিয়া, ছাপাইয়া, পদে দলিত করিয়া দুঃখজয়ের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গীতায় অন্যত্র বলিয়াছে, "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ভূতসকল নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, নিগ্রহে কি হইবে? দুঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, প্রেমশূন্য হইয়া যায়। দুঃখে অশ্রুজল মোচন করিব না, যন্ত্রণা-বোধ স্বীকার করিব না, "এ কিছু নহে" বলিয়া নীরবে সহ্য করিব. স্ত্রীর দুঃখ, সন্তানের দুঃখ, বন্ধুর দুঃখ, জাতির দুঃখ অবিচলিত চিত্তে দেখিব, এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরের তপস্যা—তাহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে, শেষ বা চরম শিক্ষা নহে। দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় জ্ঞান, শান্তি, সমতা। শান্তভাবে সুখ-

দুঃখ গ্রহণ করাই প্রকৃত পথ। প্রাণে সুখ-দুঃখের সঞ্চার বারণ করিব না, বুদ্ধি অবিচলিত করিয়া রাখিব। সমতার স্থান বুদ্ধি, চিত্ত নহে, প্রাণ নহে। বুদ্ধি সম হইলে চিত্ত ও প্রাণ আপনিই সম হয়, অথচ প্রেম ইত্যাদি প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি শুকাইয়া যায় না, মানুষ পাথর হয় না, জড় ও অসাড় হয় না। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি—প্রেম ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রকৃতির চিরন্তন প্রবৃত্তি, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় পরব্রহ্মে লয়। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া প্রকৃতিবর্জন অসম্ভব। যদি কোমলতা পরিত্যাগ করি, কঠোরতা হৃদয়কে অভিভূত করিবে,—যদি বাহিরে দুঃখের স্পন্দন নিষেধ করি, দুঃখ ভিতরে জমিয়া থাকিবে এবং অলক্ষিতভাবে প্রাণকে শুকাইয়া দিবে। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তপস্যায় শক্তি হইবে বটে কিন্তু এই জন্মে যাহা চাপাইয়া রাখিলাম, পরজন্মে তাহা সর্ব্বরোধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসিবে।

পরিশিষ্ট

গীতায় বিশ্বরূপদর্শন

"বন্দেমাতরম্" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদেব শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল কথাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনেব বিশ্বরূপদর্শনেব উল্লেখ কবিয়া লিখিয়াছেন যে গীতার একাদশ অধ্যাযে যে বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা লিখিত হইযাছে, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবিব কল্পনা মাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ কবিতে বাধ্য। বিশ্বরূপদর্শন গীতার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্জ্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি দ্বারা নিরসন কবিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা অদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। সেইজন্য অর্জ্জুন অন্তর্য্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল, বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, সে সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ, সেই রূপদর্শনের পরে যে জ্ঞান কথিত হয়, সে জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনাকে যদি

কবির উপমা বলি, গীতার গাম্ভীর্য্য, সত্যতা ও গভীরতা নষ্ট হয়, যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপদর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে,—কেননা বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্গত বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্ব-রূপ কারণজগতের সত্য; কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।

সাকার ও নিরাকার

যাঁহারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; যাঁহারা সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নির্গুণত্ব অস্বীকার করেন এবং আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসক এই দুই জনেরই উপর খড়্গহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্ভূত বলি। কেন না যাঁহারা সাকার ও নিরাকার দ্বিবিধ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে একেকে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পনা বলিয়া জ্ঞানের অন্তিম প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রহ্মকে সীমার অধীন করিবেন। যদি ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগ-বানকে খেলো করি, এই কথা সত্য; কিন্তু যদি ব্রহ্মের সগুণত্ব

ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথাও সত্য। ভগবান রূপের কর্ত্তা, স্রষ্টা, অধীশ্বর, তিনি কোন রূপে আবদ্ধ নহেন; তিনি যেমন সাকারত্ব দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, স্থূলপ্রকৃতিব নিয়ম বা দেশকালের নিয়মরূপ জালে তাঁহাকে ধরিবাব ভাণ করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, আমি তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর দেখি, তুমি পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফার্ডিনান্দ, এ কি হাস্যকর কথা, এ কি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরহিত, নিরাকাব ও সাকার, সাধককে সাকাব হইয়া দর্শন দেন,—সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রহিয়াছেন, অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। কেন না, ভগবান দেশকালাতীত, অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খেলাব সামগ্রী, দেশ ও কালরূপ জাল ফেলিয়া সর্ব্বভূতকে ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেই জালে ধরিতে পারিব না। যতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্যসাধন করিতে যাই, ততবার রঙ্গময় সেই জালকে সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পার্শ্বে, দূরে, চারিদিকে, মৃদু মৃদু হাসিয়া বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করে। যে বলে, আমি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, সে কিছুই জানে না; যে বলে, আমি জানি অথচ জানি না, সেই প্রকৃত জ্ঞানী।

বিশ্বরূপ

যিনি শক্তির উপাসক, কর্ম্মযোগী, যন্ত্রীব যন্ত্র হইয়া ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কবিতে আদিষ্ট তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপদর্শনেব পূর্ব্বেও তিনি আদেশলাভ কবিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, বজু হইযাছে, পাশ হয় নাই। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মশিক্ষাব ও তৈয়ারী হইবার সময। বিশ্বরূপদর্শনে কর্ম্মের আরম্ভ। বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকাব হইতে পারে—যেমন সাধনা, যেমন সাধকেব স্বভাব। কালীর বিশ্বরূপ-দর্শনে সাধক জগৎময় অপরূপ নাবীরূপ দেখেন, এক অথচ অগণন্ দেহযুক্ত, সর্ব্বত্র সেই নিবিড়-তিমির-প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়্গের আভা নযন ঝলসিয়া নৃত্য কবিতেছে, জগৎময় সেই ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, অতিপ্রাকৃত উপলব্ধিকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা কারিবার বিফল চেষ্টা নহে। ইহা কালীব আত্মপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ, যাহা দিব্যচক্ষুতে দেখা হইয়াছে, তাহার অনতিরঞ্জিত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জুন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশ্বরূপ। একই কথা। দিব্যচক্ষুতে দেখিলেন, বাহ্যজ্ঞানহীন সমাধিতে নহে—যাহা দেখিলেন ব্যাসদেব তাহার অবিকল অনতিরঞ্জিত বর্ণনা করিলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, সত্য, জাগ্রত সত্য।

কারণজগতের রূপ

ভগবান-অধিষ্ঠিত তিন অবস্থাব কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—প্রাজ্ঞ-অধিষ্ঠিত সুষুপ্তি, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ-অধিষ্ঠিত স্বপ্ন, বিরাট-অধিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগৎ। সুষুপ্তিতে কাবণজগৎ, স্বপ্নে সূক্ষ্মজগৎ, জাগ্রতে স্থূলজগৎ। কারণে যাহা নির্ণীত ও আমাদেব দেশ-কালেব অতীত, সক্ষ্মে তাহা প্রতিভাসিত, স্থূলে আংশিকভাবে স্থূলজগতেব নিয়ম অনুসাবে অভিনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, আমি ধার্ত্তবাষ্ট্রগণকে পূর্ব্বেই বধ করিযাছি, অথচ স্থূলজগতে ধার্ত্তবাষ্ট্রগণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীবিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগবানের এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাঁহাদিগকে বধ কবিয়াছিলেন, নচেৎ ইহলোকে তাঁহাদেব বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন কাবণে, স্থূলে তাহার ছায়া মাত্র পড়ে। কিন্তু কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতন্ত্র। বিশ্বরূপ কাবণেব রূপ, স্থলে দিব্যচক্ষুতে প্রকাশিত হয়।

দিব্যচক্ষু

দিব্যচক্ষু কি? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে। যোগলব্ধ দৃষ্টি তিনপ্রকার আছে—সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মানসিক মূর্ত্তি দেখি; বিজ্ঞানচক্ষুতে আমরা সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষ্মজগৎ

ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের প্রতিমূর্ত্তি ও সাঙ্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে দেখি; দিব্যচক্ষুতে কারণজগতের নামরূপ উপলব্ধি করি,—সমাধিতেও উপলব্ধি করি, স্থূলচক্ষুর সম্মুখেও দেখিতে পাই। যাহা স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর তাহা যদি ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, ইহাকে দিব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝিতে হয়। অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু প্রভাবে জাগ্রদবস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্বরূপদর্শন স্থূলজগতের ইন্দ্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষা সত্য, কল্পনা অসত্য বা উপমা নহে।